দস্যু বনহুর

দস্যু বনহুর ও নিশাচর

রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর ও নিশাচর-৪২

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বৈজ্ঞানিক ফারহান কৌশলে বনহুরের অনুচরগণকে বন্দী করে ফেললো। বন্দী করলো রহমান, নূরী ও নাসরিনকে। বনহুরের জাহাজ 'শাহী'র মালিক হয়ে বসলো ফারহান।

ফারহান শুধু জাহাজ 'শাহী'র অধিপতিই হলো না, সে বনহুরের জিনিসপত্র এবং অনুচরদেরও অধিকারী হলো। বনহুরের অনুচরগণকে বন্দী করে রাখলো জাহাজের খোলের মধ্যে।

নূরী আর নাসরিনকে একটা ক্যাবিনে আটকে রেখে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা চালাতে লাগলো।

রহমানকে এমন এক জায়গায় আটক করে রাখলো, সে ক্যাবিনটা শুধু গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, অত্যন্ত স্যাঁত স্যেঁতে ও দুর্গন্ধময় ক্যাবিন। এ ক্যাবিন নিচে মালখানা হিসেবে ব্যবহার করতো বনহুর। লৌহশিকলে রহমানকে মজবুত করে বেঁধে রাখা হয়েছে, একটুও নড়াচড়া করবার সামর্থ্য তার নেই।

বনহুরের অনুচরগণকে বন্দী করে ফারহান গভীর জলোচ্ছ্বাসের তলা হতে রত্নসিন্দুকগুলো উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালালো। জলোচ্ছ্বাসের তলে অবতরণের জন্য বনহুরের নিয়ে আসা যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রগুলো নিয়েই সে কার্য উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ফারহান মনে করলো, বনহুর তো গভীর জলোচ্ছ্বাসের তলায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে; তাই সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং আশ্বস্ত। কেউ তাকে বাধা দেয়ার নেই, কাজেই তাড়াহুড়োর প্রয়োজনও সে তেমন মনে করলো না।

কিন্তু সে সমস্যায় পড়লো—তার অনুচরবর্গ কেউ এই ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের অতলে নামতে রাজি নয়। ফারহান অর্থ এবং রত্নসম্ভারের অনেক লোভ দেখালো, তাতেও কোনো ফল হলো না। কারণ জীবনের চেয়ে কেউ কিছুই শ্রেয় মনে করে না। তারা বললো—আমরা যদি জীবন হারাই তাহলে ঐ রত্নসম্ভার নিয়ে কি হবে?

লোভ দেখিয়ে ফারহান যখন কাউকে জলোচ্ছ্বাসের অতলে নামতে রাজি করাতে পারলো না তখন সে কঠিন হয়ে উঠলো। যে জলোচ্ছ্বাসের নীচে নামতে রাজি না হলো তাকেই সে নির্মমভাবে হত্যা করে চললো।

সে এক ভয়ঙ্কর নির্মম পৈশাচিক দৃশ্য!

একজনের পর একজনকে হত্যা করে চললো বৈজ্ঞানিক ফারহান। অনুচরগণ মৃত্যুবরণ করতে লাগলো তবু ঐ প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের তলায় নামতে কেউ সাহসী হলো না।

ফারহান দেখলো, এভাবে অনুচরদের হত্যা করলে অল্পক্ষণেই সব শেষ হয়ে যাবে। বেশি অনুচরতো সে আনতে পারেনি, বনহুরের জাহাজের তলায় খোলের মধ্যে অতি কৌশলে গোপনে কয়েকজনকে সে লুকিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। তাদের দ্বারাই সে কৌশলে বন্দী করেছিলো রহমান এবং বনহুরের অনুচরগণকে।

অবশ্য বনহুর রহমানের উপর জাহাজ 'শাহী'র সমস্ত দায়িত্বভার দিয়েছিলো বলেই ফারহান এ সুযোগ পেয়েছিলো। ফারহানকে নিতান্তভাবে বিশ্বাস করেছিলো রহমান। আর সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ফারহান তার কু'মতলব সিদ্ধ করার সুবিধা পেয়েছিলো।

ফারহান ভেবেছিলো, অক্সিজেন পাইপসহ অক্সিজেন মেশিনটা জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে নিক্ষেপ করলেই বনহুর মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু ব্যাপার ঘটেছিলো আলাদা।

বনহুর যখন গভীর জলোচ্ছ্বাসের তলায় ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছিলো তখন তার দেহটাকে প্রবল জলস্রোতের আকর্ষণ টেনে নিয়ে যেতে চাইছিলো দূরে—বহু দূরে। কিন্তু বনহুর তার অক্সিজেন পাইপের সাহায্যে নিজেকে শক্ত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো এবং এজন্যই সে ডুবুরী ড্রেসে সাধারণ অক্সিজেন পাইপ ব্যবহার না করে অক্সিজেন পাইপসহ অক্সিজেন মেশিনটা মোটরবোটে স্থাপন করেছিলো। বনহুর আর একটি কারণে এ ধরনের অক্সিজেন পাইপ ব্যবহার করেছিলো, সে কারণ হচ্ছে বনহুরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য গভীর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে অবতরণ করতে হচ্ছে। কাজেই প্রচুর অক্সিজেনের দরকার।

বনহুর যখন জলোচ্ছ্বাসের নিচে প্রায় শেষ সীমান্তে এসে গেছে, সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রত্নসম্ভারপূর্ণ শিকলবাঁধা লৌহ সিন্দুকগুলো, ঠিক সে মুহূর্তে সে বুঝতে পারে তার অক্সিজেন পাইপ বিকল হয়ে গেছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর এক ঝটকায় খুলে ফেললো মুখ থেকে অক্সিজেন পাইপসহ মুখোসটা।

বনহুরের মুখের মুখোস সহ অক্সিজেন পাইপটা খসে যেতেই জলোচ্ছ্বাসের প্রবল টানে বনহুর তলিয়ে গেলো আরও অতলে। চোখের সম্মুখে ঝরে পড়লো তার অসংখ্য আলোর ফুলঝুরি। মৃত্যুর স্বাদ প্রাণ ভরে গ্রহণ করলো বনহুর।

বনহুরের দেহটা ঘুরপাক খেয়ে ছুটে চললো জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড আকর্ষণে, সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে গেলো তার। কিন্তু ভাগ্য বলতে হবে, বনহুরের দেহটা কোনো পাথরে বা ডুবন্ত পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেলো না। একটি বার আছাড় খেলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো তার দেহের হাড়গোড়গুলো। মাংস থেতলে যেতো।

বনহুরের সংজ্ঞাহীন দেহটা জলপ্রপাতের স্বল্প জলে একটি পাথরের গায়ে এসে আটকে রইলো। উপরে সচ্ছ নীল আকাশ, নিচে খরস্রোতা জলপ্রপাত। শুভ্র একটি পাথরের গায়ে আটকে রয়েছে—সে জীবিত কি মৃত বুঝবার উপায় নেই।

একসময় সংজ্ঞা ফিরে এলো বনহুরের, ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো, উঠে বসার চেষ্টা করলো কিন্তু সক্ষম হলো না। যদিও সেখানে জলের গভীরতা খুব বেশি নয় তবু স্রোতের টানে দেহটা নড়ছিলো ভীষণভাবে। জমে বরফ বনে গেছে যেন তার শরীরটা।

তখনও বনহুরের চিন্তাশক্তি স্বচ্ছ হয়নি, সে ভাবতে পারছে না কি করে এখানে এসেছে সে, কিছুই মনে পড়ছে না তার।

ক্রমান্বয়ে সূর্য তীক্ষ্ণ প্রখর রূপ ধারণ করে।

খরস্রোতা জলধারা উষ্ণ হয়ে উঠে একসময়।

বনহুর অতি কষ্টে একটা পাথর খণ্ড ধরে তার উপর উঠে বসতে সক্ষম হলো। এখন তার আস্তে আস্তে স্মরণ হলো সব কথা। নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনায় অক্সিজেন পাইপটা পানির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো কিংবা বোটখানা

জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যাওয়ায় অক্সিজেন পাইপ ফারহানের হস্তচ্যুত হয়ে এই অঘটন ঘটেছে।

বনহুর পাথরখণ্ডটার উপরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তাকালো দূরে—অনেক দূরে, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। সূর্যের প্রখর তাপে শরীরটা বেশ শক্ত আর সবল মনে হলো তার। এবার বনহুর নেমে পড়লো, এখানে জলের গভীরতা এক হাঁটুর বেশি নয়। এগুতে লাগলো বনহুর তীরের দিকে।

অনেক কষ্টে এগুতে হচ্ছিলো বনহুরকে, কারণ জলস্রোতে তার পা দু'খানা যেন কেটে ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিলো। টলছে তার ভারী দেহটা মাতালের মত।

কয়েক হাত দূরেই তীর, এটুকু যেতেই তার বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হলো। উঁচুনীচু পাথুরিয়া তীরভূমির উপরে এসে দাঁড়ালো বনহুর। এখনও তার দেহে ডুবুরী ড্রেস রয়েছে মুখে শুধু অক্সিজেন পাইপসহ মুখোসটি নেই। বনহুর এবার নিজকে হাল্কা করে নেবার জন্য শরীর থেকে ডুবুরী ড্রেস খুলে ফেলে দিলো। ডুবুরী ড্রেসের নিচে সিল্ক নাইট ড্রেস আকারে এক ধরনের পোশাক ছিলো কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না।

তীর ধরে এগিয়ে চললো বনহুর।

নির্জন বন এলাকায় মনুষ্য সাড়া পেয়ে আশেপাশের জীবজন্তুগুলো হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠলো। শীল মাছগুলো তীর থেকে লাফিয়ে পড়তে লাগলো জলপ্রপাতের মধ্যে।

বনহুর যতদূর সম্ভব পা চালিয়ে চললো। ভাবছে সে, না জানি রহমান আর তার দলবল কেমন আছে। নূরী, নাসরিন এরা কেমন আছে। কোনো বিপদ ঘটেনিতো ওদের? বনহুর বিস্মৃত হয় নিজ বিপদের কথা।

বনহুর তার নির্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লাগলো। যে স্থানে রয়েছে সেই সাপুড়ে সর্দারের গুপ্তরত্ন ভাণ্ডারের লৌহ সিন্দুকগুলো, আর রয়েছে সেগুলো উদ্ধারের জন্য বনহুরের নিয়ে আসা যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র এবং রহমান, ফারহান, নূরী ও অন্যান্য সকলে।

জলপ্রপাতের দু'ধার অত্যন্ত খাড়া, কোথাও বা ঢালু, কোথাও বা উঁচুনীচু। প্রায় সব জায়গাতেই এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে ছোটবড় পাথরখণ্ড। পাথরখণ্ডের ফাঁকে মাঝে মাঝে আগাছা জন্মেছে, ছোটবড় নানা রকমের সবুজ ঝাড়। বনহুর চলেছে, কখনও বা একটু জিরিয়ে নিচ্ছে পাথরখণ্ডে বসে।

সূর্য এখন মাথার উপরে প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে। গা ঘেমে নেয়ে উঠেছে বনহুরের। জামাটা ভেজা ছিলো, তারপর শুকিয়ে গিয়েছিলো একসময়; আবার ভিজে চুপসে উঠেছে ঘামে। হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিচ্ছিলো বারংবার।

বনহুর যতই এগুচ্ছে ততই তার মন আশায়-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে, অদূরে পর্বতমালা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে পর্বতমালার আড়ালে আছে তার সেই নির্দিষ্ট স্থানটি।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে তখন। বনহুর এসে পৌঁছলো সেই জায়গায় যেখানে রেখে গেছে তার দলবল এবং রত্নসম্ভার উদ্ধারের যন্ত্রপাতি আর আসবাবপত্র।

কিন্তু নিকটবর্তী হতেই চমকে উঠলো বনহুর, দেখতে পেলো সে এক নির্মম অদ্ভুত কাণ্ড! ফারহান একটি লোককে চাবুক দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করছে! কেমন যেন সন্দেহের ছায়া পড়লো বনহুরের মনে। একটা টিলার আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো, ব্যাপারটা যেন রহস্যময় লাগছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই বনহুর সব বুঝতে পারলো। ফারহান বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই অক্সিজেন পাইপসহ যন্ত্রটা জলমধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো। একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের কোণে।

❑

ফারহান যাকে এতোক্ষণ চাবুক দ্বারা আঘাত করছিলো সে লোকটি যে দস্যু বনহুরের অনুচর নয় তা সে বুঝতে পেরেছে। আরও বুঝতে পেরেছে,

লোকটাকে ফারহান জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে অবতরণের জন্যই এভাবে শাস্তি দিচ্ছে। হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে, ফারহান লোকটার বুকে সমূলে একখানা ছোরা বিদ্ধ করে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা টেনে বের করে নিলো।

ছোরাখানা লোকটার বুক থেকে টেনে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এলো তাজা লাল টকটকে রক্ত।

বনহুর অধর দংশন করলো।

ততক্ষণে ফারহান লোকটাকে লাথি মেরে ফেলে দিলো জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে। বনহুর তীক্ষ্ণভাবে চিন্তা করে চললো যাকে হত্যা করা হলো কে সে? শুধু সেই নয়, ফারহানের আশেপাশে আরও কয়েকটি অপরিচিত মুখ লক্ষ্য করলো বনহুর। এ লোকগুলো যে ফারহানের লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এরা এখানে এলো কি করে? রহমান ও তার লোকজন সব গেলো কোথায়?

বনহুর ফারহানের কার্যকলাপ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করেই সব অনুমান করে নিলো। এখানে অপেক্ষা করা উচিত মনে করলো না সে। নানারকম আশঙ্কা তার মনে উঁকি দিয়ে গেলো। দ্রুত অগ্রসর হলো বনহুর তার জাহাজ 'শাহী' অভিমুখে। কিন্তু জাহাজ 'শাহী' তখন তীর ছেড়ে বহুদূরে সমুদ্র মাঝে ভাসমান রয়েছে, সেখানে পৌঁছানো মুশকিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমান্বয়ে জমাট বেঁধে উঠছে।

বনহুর পাহাড়ের এক স্থানে দাঁড়িয়ে দেখলো, দূরে—অনেক দূরে সমুদ্রগর্ভে আলোর ছড়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। এ আলো যে তারই জাহাজের আলো তাতে ভুল নেই। বনহুর কিভাবে সেখানে পৌঁছবে ভাবতে লাগলো।

বেশিক্ষণ এখানে অপেক্ষা করাও সম্ভব নয় কারণ রাত্রির অন্ধকার যতই ঘন হয়ে আসবে ততই বিপদের আশঙ্কা বাড়বে, নানারকম হিংস্র জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটবে। বনহুর এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, হিংস্র জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার সম্বল কিছুই নেই একমাত্র দেহের শক্তি ছাড়া।

কিন্তু হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার মত শক্তি কোনো মানুষের দেহেই নেই, তাছাড়া মানুষের দাঁত, নখও জন্তুর মত মারাত্মক

নয়। বনহুরের নিজের বিপদের কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। সে ভাবছে, ফারহান কি করে বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ পেলো। রহমান ও তার অনুচরগণ কি মরে গিয়েছে? এই মুহূর্তে রহমান এবং অনুচরগণ কোথায়? তাদের একজনকেও তো দেখেনি বনহুর ফারহানের আশেপাশে, তবে কি তারা জাহাজে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। বনহুর রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুরের কানে এলো মোটরবোটের শব্দ। বনহুর বুঝতে পারলো, ফারহান আজকের কাজ শেষ করে জাহাজে ফিরে চলেছে।

যে স্থানে তখন বনহুর অপেক্ষা করছিলো তারই অনতিদূর দিয়ে জলপ্রপাতের একটি শাখা চলে গিয়েছিলো। এই শাখা বেয়েই ফারহান ফিরে চলেছে জাহাজ 'শাহী'তে। এপথে এগুলে পথ স্বল্প হয়ে আসে, কাজেই বুদ্ধিমান ফারহান এদিক দিয়ে চলাফেরা করে থাকে।

বনহুর লক্ষ্য করলো, একটি নয়; বেশ কয়েকখানা মোটরবোটের শব্দ তার কানে ভেসে আসছে। এক মুহূর্তে বনহুর ভেবে নিলো এখন তার কি কর্তব্য। দ্রুত এগুলো অন্ধকারে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে জলপ্রপাতের দিকে। মোটরবোটগুলো নিকটবর্তী হবার পূর্বেই তাকে নিচে পৌঁছতে হবে। যেদিক থেকে মোটরবোটের শব্দ ভেসে আসছিলো তার চেয়ে অনেকটা এগিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো বনহুর। অন্ধকারে পথ চলা তার চিরদিনের অভ্যাস, কাজেই অন্ধকার ঘন হলেও তার চলতে কোনো অসুবিধা হলো না। বনহুরের দেহের পোশাক অত্যন্ত হাল্‌কা মসৃণ থাকায় চলতে তার সহজ লাগছিলো।

মোটরবোটগুলো নিকটবর্তী হবার পূর্বেই বনহুর পৌঁছে গেলো জলপ্রপাতের পাশে। জলোচ্ছ্বাসের কলকল শব্দ আর অদূরে এগিয়ে আসা মোটরবোটগুলোর শব্দ মিলে নির্জন পাহাড়িয়া বনভূমি যেন সজাগ হয়ে উঠছে।

এতোটা পথ দ্রুত আসায় বনহুর ঘেমে উঠেছিলো রীতিমত। জলপ্রপাতের ধারে এসে দাঁড়াতেই শীতল বাতাস তার দেহটাকে ঠাণ্ডা করে দিলো।

ক্রমেই মোটরবোটগুলো অতি নিকটে এসে পড়েছে। শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে শোনা যাচ্ছে। বনহুর অন্ধকারে নিজ দেহের দিকে তাকালো, নিজের হাতখানাও দেখতে পাচ্ছে না সে। নিশ্চিন্ত হলো বনহুর যেন।

তার সম্মুখ দিয়ে একটি একটি করে তিনখানা মোটরবোট পার হয়ে গেলো, বনহুর আন্দাজ করে নিয়েছে আরও দু'খানা বাকি রয়েছে পিছনে। এ দুটোর একটিকে বনহুর তার বাহন হিসেবে গ্রহণ করে নেবে।

জলপ্রপাতের পরিসর প্রশস্ত ছিলো না, মাত্র কয়েক হাত নিয়ে জলধারা একটি নালা আকারে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

বনহুর যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলো মোটরবোটগুলো ঠিক তার কয়েক হাত দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে। দিনের বেলা হলে বনহুর কিছুতেই মোটরবোটের আরোহীদের দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মগোপন করতে সক্ষম হতো না, কিন্তু এখানে তাকে কেউ দেখতে পেলো না।

বনহুর অনুমান করে নিয়েছে মোটরবোটগুলোর প্রথমটিতেই রয়েছে ফারহান, শেষগুলোতে রয়েছে তার অনুচরগণ। বনহুর শেষ মোটরবোটখানাকেই তার বাহন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য জলপ্রপাতে নেমে পড়লো। এতো বেশি জলস্রোত যার জন্য বনহুর নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলো না। অতি কষ্টে বনহুর সাঁতার দিলো, ঠাণ্ডা পানিতে যদিও জমে যাবার উপক্রম হলো তার হাত-পা, তবু তাকে দক্ষ সাঁতারুর মত এগুতে হলো।

এগিয়ে আসছে পিছনের মোটরবোটখানা।

জলপ্রপাতের পরিসর স্বল্প হওয়ায় মোটরবোটগুলো সাবধানে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলো, কাজেই বনহুর অল্প চেষ্টাতেই পিছনের মোটরবোটখানাকে ধরে ফেলতে সক্ষম হলো। অন্ধকারে একটুও টের পেলো না মোটরবোটচালক। বনহুর কিছু সময় মোটরবোটখানা ধরে সাঁতার কাটলো তারপর আলগোছে পিছন থেকে উঠে পড়লো। অন্ধকার হলেও বনহুর টের পেলো, সেই বোটে মাত্র একজন লোক রয়েছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর লোকটার মুখ চেপে ধরলো, একটুও চিৎকার বা টু শব্দ করার সুযোগ পেলো না লোকটা।

বনহুর লোকটার গলায় তার বলিষ্ঠ বাম হাতের চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে এলো ওর দেহটা। বোটখানা আচমকা ঘুরপাক খেয়ে উল্টে

যাওয়ার উপক্রম হলো, কারণ মোটরবোটের হ্যাণ্ডেল খসে পড়লো লোকটার হাতের মুঠা থেকে।

বনহুর দ্রুতহস্তে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে লোকটার শিথিল দেহটাকে জলপ্রপাতে নিক্ষেপ করলো। সম্মুখস্থ মোটরবোটগুলো এবার স্পীডে এগুতে শুরু করেছিলো তাই এতো সহজে বনহুর কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম হলো, একটুও টের পেলো না কেউ। আগের বোটগুলো ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বনহুর তার বোটখানার স্পীড আরও কমিয়ে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে সাউণ্ড সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলো একসময়।

আগের বোটগুলো থেকে বেশ কিছু দূরে পিছিয়ে পড়লো বনহুর তার বোটখানা নিয়ে। এবার বনহুর হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দাঁড় বেয়ে এগুতে লাগলো, তার মতলব জাহাজ 'শাহী'তে পৌঁছতে যত বিলম্ব হয় ততই মঙ্গল।

❑

বনহুর যখন তার প্রিয় জাহাজ 'শাহী'র নিকটে পৌঁছলো তখন রাত গভীর হয়ে এসেছে। সমস্ত জাহাজখানা নিঝুম নিস্তব্ধ।

বনহুর জাহাজের পিছন অংশে বোট নিয়ে এসে দাঁড়ালো। বেশি সময় লাগলো না তার জাহাজের ডেকে এসে পৌঁছতে।

ফারহান সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলো, সে জানে দস্যু বনহুরের মৃত্যু ঘটেছে। আর বনহুরের সহকারী রহমান জাহাজের খোলে বন্দী, অন্যান্য অনুচর আবদ্ধ রয়েছে। নূরী-নাসরিনকে সে ভাবে বন্দী করে না রাখলেও তাদের ক্যাবিনের বাইরে আসার কোনো উপায় ছিলো না। কাজেই ধরতে গেলে ফারহানের সাবধানতার কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

ফারহান নিজ ক্যাবিনে নেশা পানে মত্ত ছিলো। তার সহকারীদলও নেশা পান করে কেউ বা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো, কেউ জড়িত কণ্ঠে আবোলতাবোল বুলি আওড়াচ্ছিলো!

বনহুর ডেকের অন্ধকারে আত্মগোপন করে এগিয়ে চললো। ঠিক ফারহানের ক্যাবিনের সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর, তার কানে এলো ফারহানের জড়িত কণ্ঠ।

বনহুর ক্যাবিনের পিছন দিকে এসে দাঁড়ালো। একটা ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ভিতরে। দেখলো, ফারহান একটা টেবিলের সম্মুখে বসে আছে, টেবিলে একটা বোতল। সেটা কিসের বোতল বুঝতে বাকি রইলো না বনহুরের।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে আপন মনে বললো, শয়তান!

বনহুরের জাহাজে ফারহান একজন দক্ষ বৈজ্ঞানিক হিসেবেই আশ্রয় পেয়েছিলো। বিশ্বাস করেছিলো বনহুর ওকে আপন অনুচরদের মতই। সেই ফারহান যে এতোখানি শয়তান তা সে ভাবতে পারেনি কোনো সময়।

বনহুরের দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হলো এই মুহূর্তে সে ওর প্রতিশোধ নিতে পারে কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিলো। ফারহান কি করে তা দেখতে চায় সে। বনহুর বেশিক্ষণ সেখানে বিলম্ব করে না, সন্তর্পণে এগিয়ে চলে অন্যান্য ক্যাবিনের দিকে। রহমান কোথায়? নূরী, নাসরিন—এরাই বা কোথায়? তার অনুচরগণই বা গেলো কোন্‌খানে?

বনহুর তার নিজের ক্যাবিনের দিকে অগ্রসর হতেই তার কানে এলো নূরীর কণ্ঠস্বর, চাপা ভীত সে কণ্ঠ। বনহুর কান পেতে দাঁড়ালো ক্যাবিনের দরজায়।

ক্যাবিনের ভিতর থেকে ভেসে এলো নূরীর গলা—নাসরিন, আর উদ্ধার নেই শয়তানটার কবল থেকে। সে বলেছে, জলোচ্ছ্বাসের তলা থেকে রত্ন-সিন্দুকগুলো উদ্ধার করার পরই আমাকে বিয়ে করবে। জানি আমার হুর আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। ঐ শয়তান ফারহান তাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই সেদিন অক্সিজেন পাইপসহ অক্সিজেন মেশিনটা জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো.....নূরী ফুঁপিয়ে কাঁদে।

বনহুর নিশ্চুপ স্তব্ধ হয়ে সব শুনে চলেছে—এবার ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলো।

নাসরিন নূরীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে—মানুষ হয়ে জন্মালে মরতে একদিন হবেই, কি করবি বোন, সর্দারওতো মানুষ ছিলেন, একদিন তাকে মরতে হতোই.....

তাই বলে এই নির্মম ভয়ঙ্কর মৃত্যু.....নূরী উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে থাকে। একটু পরে শোনা যায় পুনরায় নূরীর গলা—আমার হুরের মৃত্যু

হয়েছে আমি বেঁচে আছি, আমি কি করে এখনও বেঁচে আছি নাসরিন? না না, আমি আত্মহত্যা করবো, আমি আত্মহত্যা করবো.....

শান্ত হও নূরী, শান্ত হও। তুমি যদি এভাবে ভেঙে পড়ো তাহলে আমরা কি করে জীবন ধারণ করবো বলো? যেমন করে হোক আমাদের বাঁচতে হবে, ঐ শয়তান ফারহানের কবল থেকে উদ্ধার পেতে হবে আর উদ্ধার করতে হবে সর্দারের বিশ্বস্ত অনুচরদের। নূরী, সর্দারের এতো সাধের আস্তানা যেন বিলীন হয়ে না যায়, এ চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু কি হবে আর এসব দিয়ে? আমার হুরকে ছাড়া আমার সব ব্যর্থ। এ জীবন আমি রাখবো না নাসরিন। এ জীবন আমি রাখবো না। .....

বনহুর নিজেকে সংযত করে নিলো, তারপর এগুলো রহমান ও অন্যান্য অনুচরের সন্ধানে।

অল্পক্ষণেই রহমান ও তার অনুচরদের যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখানে পৌঁছে গেলো বনহুর।

জাহাজে বলে বন্দীদের জন্য ফারহান পাহারার তেমন কোনো ব্যবস্থা করেনি, কাজেই বনহুর সচ্ছন্দে তার জাহাজ 'শাহীর' নিচে খোলের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে।

বনহুর রহমান ও অনুচরদের নির্মম অবস্থা দেখে ব্যথিত হলো কিন্তু সে সম্মুখে গেলো না, আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করলো। বনহুর দেখতে চায় ফারহান কেমন করে তার মতলব সিদ্ধ করে।

বনহুর কৌশলে ফারহানের বিশ্বস্ত অনুচর রুস্তমকে হত্যা করে তারই ড্রেস পরে নিলো। তাকে চিনবার কোনো উপায় রইলো না।

পরদিন আবার কাজ শুরু হলো।

ফারহান তার দলবল নিয়ে মোটরবোট যোগে রওয়ানা দিলো রত্ন-সিন্দুক উদ্ধারে।

দস্যু বনহুর স্বয়ং রুস্তমের বেশে আজ ফারহানের অনুচরের দলে। তার দেহে ফারহানের অনুচরের মত ড্রেস, মুখে গালপাট্টা বাঁধা। সূক্ষ্মভাবে নিজেকে পরিবর্তন করে নিয়েছে বনহুর, সহজে চেনা মুস্কিল।

ফারহান আজ স্বয়ং জলোচ্ছ্বাসে অবতরণ করবে। সেজন্যই রীতিমত প্রস্তুত হয়ে চলেছে। সে ভেবে দেখেছে, অযথা অনুচরদের হত্যা করে

লোকসংখ্যা ক্ষয় ছাড়া কিছুই ফল হবে না, কাজেই সে নিজে রত্ন-সিন্দুকগুলো উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে।

ফারহানের প্রথম দিনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। আবার সন্ধ্যায় জাহাজে ফিরে এলো ফারহান অনুচরদের নিয়ে।

পরদিন জলোচ্ছ্বাসের অতলে অবতরণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করলো ফারহান। নানাভাবে যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা চালালো। প্রায় সমস্ত রাত ধরে চললো তার কাজ।

বনহুর ফারহানের অন্যান্য অনুচরের সঙ্গে রুস্তমের বেশে তাকে সহায়তা করে চললো। জানে না ফারহান, যাকে সে জলোচ্ছ্বাসের অতলে অক্সিজেন পাইপ নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে সে তার পাশে দাঁড়িয়ে তার কাজে সাহায্য করে চলেছে।

বনহুরের মাথায় পাগড়ী, গালে গালপাট্টা বাঁধা থাকার দরুন তাকে চিনবার কোনো উপায় ছিলো না। ফারহানের অন্যান্য অনুচরেরও শরীরে ঐ ধরনের ড্রেস ছিলো, কাজেই সন্দেহের উদ্রেক হয়নি।

ফারহান ডুবুরী ড্রেস পরে জলোচ্ছ্বাসের অতলে অবতরণ করবে। তার মুখে থাকবে অক্সিজেন পাইপ এবং পাইপের সম্মুখভাগে থাকবে অক্সিজেন পরিবেশক মেশিন। কিন্তু ফারহান সাবধানতা অবলম্বন করবে, অক্সিজেন পাইপের মেশিন থাকবে বোটের মধ্যে বসানো। কেউ যেন ইচ্ছাপূর্বক সেটা জলমধ্যে নিক্ষেপ করতে না পারে।

কাজ শেষ করে বিশ্রাম ক্যাবিনে ফিরে গেলো ফারহান। বনহুর সকলের অলক্ষ্যে একসময় তার ক্ষুদে টেলিভিশন ক্যামেরাটা ফারহানের ডুবুরী ড্রেসের সঙ্গে আটকে দিলো। এ ক্যামেরা গভীর জলের তলা হতেও সচ্ছভাবে ছবি পাঠাতে সক্ষম হবে। অত্যন্ত শক্তিশালী ক্যামেরা এটা। বনহুর তার জাহাজের যন্ত্রাগারের টেলিভিশন পর্দায় সব দেখতে পাবে।

সুচতুর ফারহান একটুও টের পায় না বা বুঝতে পারে না।

পরদিন বনহুর কেটে পড়লো, গেলো না সে ফারহানের সঙ্গে। অসুস্থতার কথা বলে রয়ে গেলো সে জাহাজে।

ফারহান দলবল নিয়ে মোটরযোগে রওয়ানা দিলো তার গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় রুস্তমকে সতর্কভাবে সাবধান করে দিয়ে গেলো

বন্দিগণ যেন কোনোক্রমে ছাড়া না পায়, তাদের দিকে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে সে।

শুধু রুস্তমবেশী বনহুর নয়, আরও দু'জন রইলো জাহাজে ফারহানের লোক, তারা বনহুরের সঙ্গে থেকে তাকে সাহায্য করবে।

বনহুর এখন ফারহানের অনুচর রুস্তমের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, কাজেই সে রুস্তম।

ফারহান দলবল নিয়ে প্রস্থান করলে রুস্তমবেশী বনহুর ফারহানের অনুচর দু'জনকে নিয়ে বসলো গল্প-সল্প করতে, উদ্দেশ্য সব কথা জেনে নেয়া।

রুস্তম বললো—মোনাই মিয়া, শরীরটা আজ খারাপ, তাই মালিকের সঙ্গে গেলাম না। মনটা বড় অস্থির লাগছে।

মোনাই মিয়া বললো—রেখে দাও মন্‌ডা অস্থির লগ এখন কও রত্ন পাইবো ক্যামনে?

কেন, মালিক তো আমাদের ফাঁকি দিবে না। কাজ উদ্ধার হলে আমরাও নিশ্চয়ই মাল পাবো, তখন রাজা হবোরে, রাজা হবো।

আরে ছোঃ কি যে বলছো রুস্তম, মালিক মাল দেবে আমাগো? শেষে জানটা পাও কিনা দেহো।

তা তো দেখছি মোনাই মিয়া, জলের তলায় নামার জন্য কিই না কাণ্ড করলো মালিক.....

কাণ্ড, ওরে কাণ্ড কয়? কতগুলাকে হত্যা করলো হিসাব রাখছো? আগে জানলে আমরা আইতাম না।

ও কথা বলো না—মালিক শুনলে খতম করে ফেলবে। রুস্তম এ কথা-সে কথা বলে আসল কথা জানতে চায় কি করে তারা এলো এখানে। বললো সে এবার—মোনাই মিয়া, আমরা যে এলাম তা কি কম কষ্ট হয়েছে। জানটা একেবারে গিয়েছিলো আর কি। তোমার কেমন লাগছে?

আঃ কি যে কষ্ট! সাত সাতটা দিন বদ্ধ জাহাজের খোলের মধ্যে দমডা যেন আটকা গেছিলো আর কি?

মোনাই মিয়ার কথায় রুস্তমবেশী বনহুর যেন চমকে উঠলো ভীষণভাবে, তারই জাহাজের খোলের মধ্যে ফারহান এতোগুলো লোককে

গোপনে লুকিয়ে নিয়েছিলো। আশ্চর্য সাহস ফারহানের। রহমানের উপর বনহুরের রাগ হলো তার নির্বুদ্ধিতার জন্য। অবশ্য তার নিজেরও দোষ আছে, সম্মুখ খোলের ভিতরে তার সশস্ত্র অনুচরগণকে পরীক্ষা করে দেখার সময় পিছনের খোলটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিলো, কিন্তু বনহুর দেখেনি—বিশ্বাস ছিলো, তার জাহাজে কোনো বিশ্বাসঘাতক স্থান পাবে না বা পেতে পারে না। বনহুর মুখোভাব স্বাভাবিক রেখেই বললো—দম তো বের হবার জোগাড় হয়েছিলো আমারও কিন্তু.....

ও কথা ভাইবা আর কি অইবে কও রুস্তম বাই। চলো ম্যাইয়া দু'ডারে দ্যাইখা আসি।

ম্যাইয়া! কোন্ মেয়ে? অবাক কণ্ঠে বললো রুস্তম।

সেকি ভুইল্যা গেছো? ঐ যে দস্যু বনহুরের বৌ আর বোনডা? যারে তুমি.....বলে হাসলো মোনাই মিয়া।

ও বুঝেছি। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

সত্যি আমাগোও খুব পছন্দ, তা মালিক কি তোমার সাধ পূরণ অইতে দিবো। শুনছি মালিক দস্যু বনহুরের বৌডারে বিয়া করবো।

আমরা তার চাকর। মালিকের সাধ পূরণ করতেই হবে। আমাদের সাধ কি আর হবে.....একটা নিশ্বাস ফেললো রুস্তম।

একদিনেই এতো নিরাশ অইছো? কালই না কইল্যা নূরীরে না পাইলে জান দিবা।

কিন্তু নূরী আমাকে কি.....

নেও উঠো চলো দেহি। সোনাই মিয়া রুস্তমের হাত ধরে টেনে তুললো।

রুস্তম বললো—বাঘা মিয়া কোথায়?

সে আরাম কইর‍্যা নাক ডাকাইছে, নেও চলো রুস্তম বাই। আজ এ বেলা যদি একটু পেরেম কইর‍্যা নিতে পারো।

রুস্তমবেশী বনহুর নিজের গালপাট্টাটা আরও ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললো—চলো।

নূরী আর নাসরিনের কামরার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো মোনাই মিয়া, পেছনে রুস্তম।

বললো মোনাই মিয়া—দাঁড়াও চাবিডা বাইর কইর‍্যা নেই। চাবি বের করে ক্যাবিনের দরজা খুলে ফেললো সে, তারপর বললো—আইসো রুস্তম বাই।

রুস্তম মোনাই মিয়ার সঙ্গে ক্যাবিনের ভিতরে প্রবেশ করলো। নূরী আর নাসরিন বলেছিলো, ক্যাবিনের দরজা খুলে যেতেই ওরা দু'জন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, এবার তাকালো ওরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে রুস্তম আর মোনাই মিয়ার দিকে।

রুস্তম তাকালো নূরী আর নাসরিনের দিকে—আহা, এ ক'দিনেই তাদের চেহারা কি জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে! রোগা জিরজিরে হয়ে গেছে যেন ওরা দু'জনা।

মোনাই রুস্তমকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললো—অমন হা কইর‍্যা কি দেখতাছো রুস্তম বাই?

মোনাই মিয়ার কথায় রুস্তম সম্বিৎ ফিরে পায় যেন। বলে উঠে—এ্যাঁ।

হঠাৎ যেন চমকে উঠে নূরী, আজ রুস্তমের কণ্ঠস্বর যেন তার কানে অমৃত বর্ষণ করে। নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকায় সে রুস্তমের দিকে। রুস্তম তাড়াতাড়ি একটু কেশে গলার স্বর পাল্টে নিয়ে বলে আবার—মোনাই মিয়া, আজ থাক, আবার আসা যাবে, চলো।

কেন, আজ কি অইলো?

ভাল লাগছে না।

রুস্তম বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

অগত্যা মোনাই মিয়া রুস্তমকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলো। চলে যাবার সময় একবার লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো নূরী আর নাসরিনের দিকে।

❑

মোনাই মিয়া আর বাঘা মিয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে একসময় রুস্তমবেশি বনহুর তার যন্ত্রাগারে টেলিভিশন মেশিনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। পরপর কয়েকটা সুইচ অফ করার পর একটি বোতামে চাপ দিলো, দৃষ্টি তার

সম্মুখের ক্ষুদে পর্দায়। বোতামে চাপ দিতেই টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠলো স্পষ্ট একটা প্রতিচ্ছবি, বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো বনহুর। উচ্ছল জলরাশির মধ্যে ডুবুরী ড্রেস পরা একটি লোক নিচের দিকে নেমে চলেছে। লোকটি কে চিনতে বাকি রইলো না বনহুরের— লোকটি বিশ্বাসঘাতক বৈজ্ঞানিক ফারহান। আপন মনেই বনহুর হেসে উঠলো, তারপর দেখতে লাগলো মনোযোগ সহকারে।

জলোচ্ছ্বাসের প্রবল টানে ফারহানের দেহটা টেলিভিশন পর্দায় মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে আসছিলো তবু বেশ বুঝা যাচ্ছিলো, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে আরও নিচে যাওয়ার জন্য।

হঠাৎ ক্যাবিনের বাইরে কারো পদশব্দ শোনা গেলো। বনহুর তৎক্ষণাৎ বোতাম চাপ দিয়ে পরে সুইচগুলো অফ করে দিলো, তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে।

বনহুর ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেলো সে দিকে এগিয়ে আসছে মোনাই মিয়া আর বাঘা। বনহুরকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো মোনাই—এই যে রুস্তম বাই, তুমি এহানে, আর তোমারে আমরা খুঁইজা মরছি সারাটা জাহাজে। কই ছিলা কও তো?

রুস্তম বলে উঠলো—কেন, আমি তো এখানে ছিলাম। এ ক্যাবিনেই যন্ত্রপাতিগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখছিলাম।

হেসে উঠলো মোনাই—ইঞ্জিনিয়ার হবার সখ অইছে নাহি?

না, অতোবড় সখ আমার নেই ভাই, শুধু দেখছিলাম একটু। তা আমাকে এতো খোঁজাখুঁজি করছো কেন মোনাই মিয়া?

খুঁজবো না, কখন থ্যাইকা তোমার পাত্তাটা নাই। দেখছো বেলা কত অইলো, খাইবা না?

ওঃ সে কথা ভুলেই গেছি, চলো চলো।

রুস্তম, মোনাই আর বাঘা খাবার ঘরের দিকে এগুলো। বাঘার চেহারাটা সত্যিই বাঘের মত, কথাও বলে কম। মাঝে মাঝে কেমন যেন ঘোৎ ঘোৎ আওয়াজ করে লোকটা, ওকে দেখে হাসি পায় রুস্তমের।

খেতে বসে ওরা তিনজনা—রুস্তম মোনাই আর বাঘা। রুস্তমের মনে চিন্তা—তার নূরী, নাসরিন এরা কিছু খেয়েছে কিনা। রহমান ও তার

অনুচরগণ কি ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে, ওদের কি নির্মমভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে। খেতে খেতে ভাবে রুস্তম কত কথা। একসময় বলে উঠে রুস্তম—মোনাই, আমরা তো খাচ্ছি, বন্দীদের খেতে দেবে না?

ওঃ আজ দেখছি বন্দীদের জন্য তোমার দরদের অন্ত নাই। কাইল সকালে খাইছে আবার আগামীকাইল খাইতে দেওয়া অইবো। বেটারা না মরলেই হইলো।

রুস্তমের মনটা ব্যথায় টনটন করে উঠলো। কাল খেয়েছে আবার আগামীকাল খেতে দেবে—উঃ কি ভয়ঙ্কর সাজা! বললো রুস্তম—ওরা যেন পুরুষ মানুষ, মেয়েরা তো সহ্য করতে পারবে না। মোনাই, মেয়ে দুটিকে চারটি খেতে দাও না?

হেঁ হেঁ, ওদের খাইতে দিমু। আগে নিজেদের প্যাটটা ভরাইয়া লই। গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো মোনাই।

খাওয়া শেষ করে রুস্তম মোনাইসহ নূরী আর নাসরিনের খাবার নিয়ে হাজির হলো!

নূরী আর নাসরিনের সম্মুখে খাবার রেখে দাঁড়ালো রুস্তম আর মোনাই।

নূরী রুস্তমকে দেখতে পারতো না দু'চোখে কারণ রুস্তম সুযোগ পেলেই তার কাছে প্রেম নিবেদন জানিয়ে বসতো। আজও নূরী রুস্তমকে দেখে মুখ ফিরিয়ে বসলো।

নাসরিন ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়েছিলো, তাড়াতাড়ি খাবারগুলো এগিয়ে নিয়ে বললো—নাও নূরী, শুরু করো।

তুই খা, আমি খাবো না। বললো নূরী।

মোনাই বললো—খাইয়্যা নেও মাইয়্যা, খাইয়্যা নেও এই বেলা। মালিক আজ মণিমাণিক্য নিয়া আইবো তখন আর খাইবার সময় পাইব্যা না। আর একটা কথা শোন, রুস্তম বাই তোমারে বিয়া করতে চায়, কও কারে তুমি চাও? কারে তুমি বিয়া করতে চাও, কও?

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো নূরী—কাউকেই আমি বিয়ে করবো না। যাও, তোমরা যাও এখান থেকে। যাও বলছি, নাহলে তোমাদের শয়তানির কথা সব বলে দেবো তোমাদের মালিকের কাছে।

মোনাই-এর মুখ কালো হয়ে উঠলো মুহূর্তে, ফ্যাকাসে মুখে বললো—চলো রুস্তম বাই, এহন চলো।

রুস্তম বললো—আমি কি মালিককে ভয় করি? যেমন করে হোক ওকে আমি বিয়ে করবোই।

কও কি রুস্তম?

হাঁ, বললাম।

দেহো রুস্তম বাই, ম্যাইয়া যদি মালিকেরে কইয়্যা দেয় তাইলে মাথা কাটা যাইবো, জানো। ?

জানি, কিন্তু আমিও বললাম নূরীকে আমার চাই.....কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো।

মোনাইও রুস্তমকে অনুসরণ করলো।

ওরা বেরিয়ে যেতেই নাসরিন বললো—নূরী, খেয়ে নাও, না হলে মরে যাবে।

মরতে দে, আমাকে মরতে দে নাসরিন। কি হবে বেঁচে থেকে বল্? একদিকে শয়তান ফারহান আর একদিকে বদমাইশ রুস্তম.....না না, আমি আর বাঁচতে চাই না। বাঁচতে চাই না.....দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো নূরী।

নাসরিন ওকে অনেক করে বুঝাতে লাগলো, তারপর চারটি খেলো নূরী।

রুস্তম মোনাইসহ বেরিয়ে এলো বটে কিন্তু তার মন তখন অস্থির হয়ে পড়েছে, যন্ত্রাগারে প্রবেশের জন্য আনচান করছে সে। বললো রুস্তম—খাবার পর একটু নেশা না করলে ভাল লাগে না। চলো মোনাই, একটু নেশা করা যাক।

রুস্তমের কথায় খুশিতে উপচে উঠলো মোনাই মিয়া। বললো—বাইচ্যা থাকো রুস্তম বাই, আমিও ঐ কথা কইবার.....

চেয়েছিলাম, তাই না?

হেঁ রুস্তম বাই। চলো এই বেলা বাঘা গড়াইয়্যা নিচ্ছে। আমরা দু'বোতল শেষ কইর‍্যা দিমু।

তা হয় না মোনাই মিয়া, বাঘাকে ছেড়ে ফূর্তি হবে না। ডাকো, বাঘাকে ডেকে আনো, তিনজন মিলে খুব করে খাওয়া যাবে।

আচ্ছা রুস্তম বাই তুমি যাও, আমি বাঘাকে ডাইক্যা অনতাছি। মোনাই কথাটা বলে বাঘা যেদিকে আছে সেদিকে চলে যায়।

তারপর চলে তিনজন মিলে আমোদ-আহলাদ আর নেশা পান। রুস্তম নেশা পানে যোগ দিলেও আসলে সে নেশা পান করলো না। সে শুধু পান করার অভিনয় করে চললো। মোনাই আর বাঘা কিন্তু অল্পক্ষণেই নেশায় চুর হয়ে পড়লো। সংজ্ঞা লুপ্ত হলো ওদের।

রুস্তম মোনাই মিয়া আর বাঘাকে একটা ক্যাবিনে আটকে রেখে সোজা সে যন্ত্রাগারে প্রবেশ করলো। টেলিভিশন সুইচ অন করে বোতামে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন পর্দায় ফুটে উঠলো জলোচ্ছ্বাসের তলায় ফারহানের চেহারাটা। এবার বনহুর বিস্মিত হলো, কারণ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—ফারহান লৌহসিন্দুকে ক্রেন-মেশিনের শিকল আটকাচ্ছে। বনহুরের চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো সে।

ফারহান দস্যু বনহুরকে হত্যা করে তারই সংগৃহীত যন্ত্রাদি দ্বারা জংলীদের রত্ন-সিন্দুকগুলো উদ্ধার করে আত্মসাৎ করবে ভেবেছে। ঠিক বুদ্ধিমানের মতই কাজ করে চলেছে সে।

এ ক'দিন সে অযথা অনুচরদের উপর জুলুম চালিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেও ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের তলায় কাউকে নামাতে পারেনি। এতে তার লোকসংখ্যা কমে গেছে অনেক, কাজেই এবার বুদ্ধিমান ফারহান নিজেই কার্যোদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেছে। ক্রেন মেশিন দ্বারা ফারহান সহজেই রত্নভরা সিন্দুকগুলো তুলে আনতে সক্ষম হলো।

রুস্তমবেশী বনহুর তার জাহাজ 'শাহী'র যন্ত্রাগারে বসে শক্তিশালী টেলিভিশনে সব দেখলো। ফারহান শেষ অবধি এতো সহজে কাজ সমাধা করতে সক্ষম হবে তা ভাবতেও পারেনি। বনহুর হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—শয়তান ফারহান, চলে এসো এবার জাহাজে।

❑

রাজ্যজয়ের আনন্দ নিয়ে ফিরে এলো ফারহান 'শাহী' জাহাজে। পাঁচখানা মোটরবোটে পাঁচটি রত্নসম্ভারপূর্ণ লৌহসিন্দুক। প্রত্যেকটা সিন্দুকে রয়েছে সাত রাজার ঐশ্বর্য। এতো ঐশ্বর্য ফারহান পাবে, এ যেন তার কল্পনার বাইরে ছিলো।

মোটরবোট থেকে লৌহসিন্দুকগুলো ক্রেন দ্বারা জাহাজে উঠানো হলো। ফারহানের অন্যান্য অনুচরের সঙ্গে যোগ দিলো রুস্তমবেশী স্বয়ং দস্যু বনহুর, সহায়তা করে চললো সে ফারহানের কাজে।

ফারহানের খুশি আর ধরছে না, এখন কে তাকে পায়! সব যন্ত্রপাতি গুছিয়ে তুলে নিলো জাহাজে। মোটরবোটগুলোও উঠিয়ে নেয়া হলো জাহাজের ডেকে।

ফারহান তার অনুচরদের নিয়ে ফূর্তিতে মেতে উঠলো। নেশা পান করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। রত্নসম্ভার ভরা সিন্দুকগুলো খুলে দেখতে লাগলো বারবার। সিন্দুকগুলো পাশের ক্যাবিনে একটি গোপন স্থানে যত্ন সহকারে রেখে ফিরে এলো নিজের ক্যাবিনে।

ফারহানের অনুচরগণ সবাই খুশিতে আত্মহারা। মালিক তাদের উপযুক্ত মূল্য দেবে বলে কথা দিয়েছে। কাজেই সবাই এসে ফারহানের ক্যাবিনে জড়ো হয়েছে।

সকলের সঙ্গে রুস্তমও এসেছে ফারহানের ক্যাবিনে।

ফারহান পাশের ক্যাবিনে একটি সিন্দুক খুলে মেলে ধরলো তার ডালাটা। ক্যাবিনের আলোকচ্ছটায় সিন্দুক মধ্যস্থ মণিমুক্তাগুলো অপূর্ব অদ্ভুতভাবে ঝকমক করে উঠলো।

ফারহানের অনুচরদের চোখ জ্বলে উঠলো বিস্ময়ে, তারা এমন জিনিস দেখেনি কোনোদিন।

ফারহান বললো—এসো, যে যা পারো নাও।

মালিকের মুখে এমন বাক্য তারা শুনবে আশা করেনি। যা খুশি তাই নিতে পারবে তারা, উচ্ছ্বল হয়ে উঠলো আনন্দে।

বললো ফারহান—এক এক জন করে এসো আর নিয়ে বিপরীত দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। খবরদার, দু'জন এক সঙ্গে আসবে না। যাও, ক্যাবিনের বাইরে যাও তোমরা। রুস্তম, তুমি আমার পাশে থাকো।

ফারহানের অনুচরগণ বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে। সকলেরই মুখ খুশিতে দীপ্ত। তারা জানে, এ সম্পদ যে পাবে তাকে আর কোনোদিন পেটের জন্য ভাবতে হবে না।

এক একজন ক্যাবিনে প্রবেশ করবে, সম্পদ নিয়ে বেরিয়ে যাবে বিপরীত দরজা দিয়ে। প্রথম প্রবেশ করলো মোনাই, কারণ সেই সবচেয়ে ফারহানের বেশি বিশ্বাসী।

ফারহান দক্ষিণ হস্তে তুলে নিলো একখানা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা। ছোরাসহ হাতখানা সে গোপনে লুকিয়ে রাখলো লৌহসিন্দুকের আড়ালে।

ফারহানের অভিসন্ধি বুঝতে বাকি রইলো না রুস্তমের। একটুকরা ক্ষীণ হাসির আভাস ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

মোনাই এলো প্রথমে, ফারহান বললো—নাও যা তোমার খুশি.....

মোনাই-এর দু'চোখ জ্বলছে যেন, তাড়াতাড়ি হাত বাড়ালো, সিন্দুক থেকে দু'হাতে মুঠি ভরে তুলে নিলো মণিমুক্তা-হীরকখণ্ড। কিন্তু মোনাই সোজা হয়ে দাঁড়াবার পূর্বেই তার তলপেটে বিদ্ধ হলো ফারহানের হাতের সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা।

মোনাই আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো সিন্দুকটার পাশে।

ফারহান ডাকলো—এসো আর কে নেবে?

বাইরে মোনাই এর আর্তনাদ যদিও পৌঁছেছিলো তবু একজন প্রবেশ করলো, কারণ রত্নসম্ভারের লোভ সামলানো কম কথা নয়।

ফারহান তাকেও মণিমুক্তা ও হীরক নেবার জন্য আদেশ করলো।

লোকটা মোনাই-এর রক্তমাখা দেহটা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলো, কিন্তু সিন্দুকে দৃষ্টি পড়তেই তার মনটা লোভে লালায়িত হয়ে পড়লো, পারলো না নিজেকে সামলাতে। যেমন হাত বাড়ালো সিন্দুকের দিকে অমনি তার তলপেটে ছোরা বিদ্ধ হলো। আবার সেই মর্মান্তিক দৃশ্য!

ফারহান এক একজন করে হত্যা করলো তার সবগুলো অনুচরকে। কয়েকজনকে হত্যা করার পর অন্যান্য অনুচর ভয়ে পালাতে যাচ্ছিলো; তারা

চায় না ঐ রত্নসম্ভার। ফারহান তবু তাদের পরিত্রাণ দিলো না, কঠিন আদেশ তার, নিতেই হবে মণিমুক্তা-হীরা-মাণিক্য।

যে নিতে গেলো তাকেই খতম করলো ফারহান, সব শেষ করে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো সে, তারপর বললো—রুস্তম, চলো এবার রহমানের দলকে খতম করে আসি। শুধু থাকবে তুমি আর আমি, হাঃ হাঃ হাঃ, বনহুরের প্রেয়সী নূরী হবে আমার আর রহমানের প্রেয়সী নাসরিনকে পাবে তুমি। কেমন, খুশি আছো তো?

রুস্তম মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

ফারহান উঠে দাঁড়ালো—চলো, এবার নূরী আর নাসরিনের ক্যাবিনে চলো। ওদের সম্মুখে আমি হত্যা করবো রহমানের দলকে। তারপর.....তারপর সব আমার আর তোমার হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ.....হাসিতে ফেটে পড়ে ফারহান।

রুস্তম মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফারহান ক্যাবিনের বাইরে পা বাড়ালো।

রুস্তম ফারহানের অলক্ষ্যে তুলে নিলো রক্তমাখা ছোরাখানা— গুঁজে রাখলো জামার আস্তিনের মধ্যে।

ফারহান সোজা নূরী আর নাসরিনের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

রুস্তমও এসে দাঁড়ালো ফারহানের পাশে।

ফারহান লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নূরী আর নাসরিনের দিকে, বললো—এবার এসো সুন্দরী, আমার বাহুবন্ধনে এসো। এখন আমার আর কোনো দ্বিধা নেই। রুস্তম, নিয়ে যাও ওকে.....

ফারহান আর রুস্তমকে দেখেই শিউরে উঠেছিলো নূরী আর নাসরিন, তারা বুঝতে পেরেছিলো আজ তাদের ভাগ্যে আছে চরম অবস্থা। পরিত্রাণ নেই তাদের আজ ফারহানের কবল থেকে।

ফারহানের কথা শুনে কাঁপতে শুরু করেছে নাসরিন। নূরীর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে, সে দস্যুকন্যা, জীবন দিতে পারে তবু ইজ্জত হারাবে না। ফারহান এগুতেই নূরী তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলো—খবরদার, এক পা এগুবে না।

নূরীর কথায় হো হো করে হেসে উঠলো ফারহান। তারপর বললো—তোমার হাতে কি অস্ত্র আছে যার জন্য ভয় দেখাচ্ছো সুন্দরী?

নূরী তেমনি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠে—আমার দাঁত—নখ থাকতে তুমি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না শয়তান।

ফারহানের মুখে বিকৃত একটা হাসি ফুটে উঠে, বলে সে—হুঁ, তাই নাকি? আমাকে তুমি দাঁত-নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে। জানো না সুন্দরী, তোমার দস্যু-স্বামীর চেয়ে আমার দেহ অনেক শক্ত। এসো, এসো আমার কাছে.....

ফারহান নূরীকে ধরতে চেষ্টা করে।

নূরী পিছু ছুটে যায়, রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত।

রুস্তম নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ক্যাবিনের দরজায়।

ছোট্ট ক্যাবিন—নূরী আর নাসরিন নিজেদের রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু রেহাই পায় না, ফারহান ধরে ফেলে নূরীকে।

এবার কোথায় পালাবে সুন্দরী, তোমার নরম দাঁত আর নখ আমার কিছু করতে পারবে না.....ফারহান নূরীকে জড়িয়ে ধরে।

নূরী ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে।

নাসরিনও এসে ফারহানের হাত থেকে নূরীকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু শয়তান ফারহানের হাতখানাকে এতোটুকু শিথিল করতে পারছে না।

ফারহানের মধ্যে জেগে উঠেছে জঘন্য একটা পশুপ্রাণ, সে চরম আকার ধারণ করেছে।

ঠিক সে মুহূর্তে গম্ভীর কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ে রুস্তম—ফারহান!

সঙ্গে সঙ্গে ফারহান নূরীকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে তাকায় বিদ্যুৎ গতিতে—এ কণ্ঠস্বর তার পরিচিত যে?

নূরী আর নাসরিনও চমকে ফিরে তাকায়।

একি তারা স্বপ্ন দেখছে, নূরী আর নাসরিন হতবাক! ফারহানের মুখটা ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে উঠলো একদণ্ডে। রুস্তম তার গালপাট্টা খুলে ফেলেছে।

নূরী নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না, ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো রুস্তমের বুকে—হুর!

ফারহান সেই সুযোগে পালাবার চেষ্টা করছিলো কিন্তু বনহুর নূরীকে সরিয়ে দিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ালো ফারহানের। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—কোথায় পালাবে বন্ধু?

ফারহান ভাবতেও পারেনি, ঐ ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের তলা হতে দস্যু বনহুর জীবিত অবস্থায় আর কোনো দিন ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

বনহুর বললো—তোমার সহকারী রুস্তমের বেশ ধারণ করে আমি তোমার সব কুকর্ম দেখেছি। তোমার দোস্ত রুস্তমকে তোমার আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছি ফারহান, এবার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার গ্রহণ করো শয়তান.....

বনহুর কথা শেষ করার পূর্বেই ফারহান বনহুরকে আক্রমণ করে বসে।

বনহুর হেসে উঠে হাঃ হাঃ করে, পরক্ষণেই তার হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা বিদ্ধ হয় ফারহানের বুকে। তীব্র আর্তনাদ করে উঠে ফারহান, হাত দু'খানা দিয়ে চেপে ধরে নিজের বুকের ক্ষত স্থানটা। তাজা লাল রক্তে রাঙা হয়ে উঠে ফারহানের দুটি হাত, যে হাতে সে একটু পূর্বে হত্যা করেছিলো তার নিরপরাধ অনুচরগণকে। সে একাই ভোগ করতে চেয়েছিলো জংলীদের রত্নসম্ভারগুলো।

ফারহানের চোখ দুটো গোলাকার হয়ে কপালে উঠলো। ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেলো মুখ থুবড়ে ক্যাবিনের মেঝেতে। তারপর নিস্পন্দ হয়ে গেলো তার দেহটা।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—শয়তান! বিশ্বাসঘাতক!

নূরী আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো—হুর, তুমি ফিরে এসেছো। তুমি ফিরে এসেছো হুর! আমার হুর.....

বনহুরও ওকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরলো বুকে। ভুলে গেলো নাসরিনের উপস্থিতি।

বনহুর আর নূরীর এ অপূর্ব মিলন-দৃশ্যে নাসরিনের চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মাথাটা নত করে নিলো আলগোছে।

বনহুর তাড়াতাড়ি নূরীকে বাহুমুক্ত করে দিয়ে বললো—চলো দেখি রহমান আর অন্যদের কি অবস্থা হয়েছে।

নূরী, নাসরিন আর বনহুর বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে। একসঙ্গে ওরা তিনজন এগুলো জাহাজের নিচের তলায় খোলের মধ্যে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে বনহুরের অনুচরদের।

বনহুর, নূরী আর নাসরিন অন্ধকার খোলে প্রবেশ করলো।

নূরী আর নাসরিনের হস্তে মোমবাতি জ্বলছে।

রহমান বনহুরকে দেখতে পেয়ে বন্ধন অবস্থায় আনন্দধ্বনি করে উঠলো—সর্দার.....সর্দার...আপনি বেঁচে আছেন, আপনি বেঁচে আছেন সর্দার.....

বনহুর বললো—হাঁ রহমান, খোদার অসীম করুণা আর তোমাদের দোয়ায় আমি মৃত্যুমুখ হতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি।

সর্দার, সর্দার.....প্রাণভরে ডাকে সর্দারকে।

বনহুর রহমানকে মুক্ত করে দিতেই রহমান আলিঙ্গন করে সর্দারকে। নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে, যেন সে হারানো রত্ন ফিরে পেয়েছে।

তারপর বনহুর আর রহমান মিলে অন্যান্য অনুচরকে মুক্ত করে দেয়। আবার 'শাহী' জাহাজে ফিরে আসে আনন্দ উৎস। বনহুরের আবির্ভাবে তার অনুচরগণ নবজীবন লাভ করে।

রহমান সব কথা বলে বনহুরের কাছে। কিভাবে ফারহান বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, কিভাবে বনহুরের অক্সিজেন পাইপ সহ মেশিন জলোচ্ছ্বাসে নিক্ষেপ করে অপ্রস্তুত রহমানকে বন্দী করেছিলো, বন্দী করেছিলো অন্যান্য অনুচরকে।

বনহুর সব শুনে যায়, কোনো জবাব দেয় না, তারপর রহমান ও অনুচরদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে ফারহানের মৃতদেহের পাশে।

রহমান ও বনহুরের অনুচরগণ বিশ্বাসঘাতক ফারহানের শোচনীয় পরিণতি দেখে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। তারপর সবাই আনন্দধ্বনি করে উঠে।

বনহুর তার অনুচরগণের সহায়তায় ফারহান ও তার নিহত অনুচরদের মৃতদেহগুলো সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করলো। যখন ফারহানের লাশ ওরা সমুদ্রে

নিক্ষেপ করছিলো তখন রহমান বললো—শয়তান ফারহান, যাও আরও রত্নসম্ভার নিয়ে এসোগে।

বনহুরের অনুচরগণ রহমানের কথায় হেসে উঠলো আনন্দ সহকারে।

বনহুর এবার রহমান, নূরী, নাসরিন ও নিজ অনুচরদের সঙ্গে করে প্রবেশ করলো যেখানে ফারহান সেই অমূল্য সম্পদভরা লৌহসিন্দুকগুলো সাজিয়ে রেখেছিলো। বনহুর এক একটি সিন্দুকের ডালা খুলে ধরলো।

বনহুরের বাম হস্তে মশাল, দক্ষিণ হস্তে লৌহসিন্দুকের ডালাগুলো তুলে ধরেছিলো। মশালের আলোতে মণিমুক্তা আর হীরকখণ্ডগুলো ঝকমক করে উঠলো। আনন্দ আর বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগলো সবাই। তাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

বনহুর এবার জাহাজ ছাড়ার জন্য আদেশ দিলো ক্যাপ্টেন বোরহানকে।

জাহাজ 'শাহী' ফিরে চললো এবার কান্দাই অভিমুখে।

খুশীতে উচ্ছ্বল নূরী, নাসরিনেরও আনন্দ যেন ধরছে না।

রহমান ও অন্যান্য অনুচর সবাই আনন্দে ভরপুর। ওরা মনের উচ্ছ্বাসে গান ধরলো।

বনহুর সম্মুখ ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলো মেঘমুক্ত সচ্ছ নীল আকাশের দিকে। দেহে তার স্বাভাবিক নাইট ড্রেস, পায়ে হাল্কা জুতা। আপন মনে সিগারেট পান করছিলো সে। আজ তাকে নিশ্চিন্ত শান্ত মনে হচ্ছিলো।

নূরী এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে, বনহুর ওকে টেনে নিলো কাছে। নিবিড় আকর্ষণে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলো, মুখখানা তুলে ধরলো নিজের মুখের কাছে।

নূরী বললো—ছিঃ কেউ এসে পড়বে।

উঁহুঁ এদিকে এখন কেউ আসবে না নূরী। সবাই মিলে আনন্দ করছে।

❑

আস্তানায় ফিরে আসে দস্যু বনহুর তার দলবল আর সাপুড়ে সর্দারের সেই রত্নসম্ভারভরা লৌহসিন্দুকগুলো নিয়ে। আনন্দের উৎসব শুরু হয়।

বনহুর তার অনুচরদের সঙ্গে নিজেও আনন্দে মেতে উঠে, খুলে দেয় সিন্দুকের মুখ, বলে সে—তোমরা তোমাদের প্রয়োজনমতো নিতে পারো।

সর্দারের কথায় খুশিতে আত্মহারা হলো অনুচরগণ। তারা নিজেদের প্রয়োজনমতো মণিমুক্তা, হীরক, অলঙ্কার গ্রহণ করলো। এতো বেশি তাদের প্রয়োজন ছিলো না কারণ সর্দার তাদের কোনো অভাবই রাখতো না, যত অর্থ-সোনাদানা প্রয়োজন হতো , পেতো তারা সর্দারের কাছে। কাজেই কোনো লোভ ছিলো না বনহুরের অনুচরগণের।

বনহুরের লক্ষ্য ছিলো, কোনো সময় তার অনুচরদের মধ্যে যেন লোভ না জাগে। এজন্যই সে অনুচরদের অভাব কিছু রাখতো না। তাদের প্রয়োজনের বেশি সে দিতো তাদের। বনহুর অনুচরদের যেমন ভালবাসতো তেমনি শাসন করতো। অপরাধীকে ক্ষমা করতো না কোনো সময় সে।

অনুচরগণও তাই সর্দারকে যেমন ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো, তেমনি করতো ভয়। সর্দারের জন্য জীবন দিতেও পিছপা হতো না কেউ তারা।

সর্দার আজ তাদের ইচ্ছামতো মণিমুক্তা আর হীরক দান করলো। খুব খুশি হলো তারা। যা আজ পেলো তা কোনোদিন তারা চোখেও দেখেনি।

বনহুর রহমান ও তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরদের প্রতি নির্দেশ দিলো কোথায় কোন্ শহরে বা গ্রামে সত্যিকারের অসহায় দীন-দুঃখী আর অনাথ না খেয়ে ধুঁকেধুঁকে মরছে, কে কোথায় রোগ-শোকে ভুগছে, কে কন্যাদানে অসমর্থ, কার কোন্ অভাব সব জেনে নিয়ে তাদের অভাব দূর করার জন্য।

সর্দারের আদেশমতো রহমান তার অনুচরদের নানা ছদ্মবেশে বিভিন্ন দিকে পাঠাতে লাগলো। কেউ ফেরীওয়ালার বেশে, কেউ ভিখারী বেশে, কেউ চাষীর রূপ নিয়ে। কেউ বা অন্ধ সেজে। এক এক জায়গায় এক একজন সন্ধান নিতে চললো। প্রত্যেকের কাছে থাকবে ক্ষুদে ওয়্যারলেস, যখন কে কোনো সংবাদ পাঠাবে তারা কান্দাই আস্তানায়।

কায়েস চললো এক বণিকের বেশে গৌরীরাজ্যে।

বনহুরের ইচ্ছা, গৌরীরাজ্যের অবস্থা এখন কেমন জানা। সেখানে দীন-দুঃখী অসহায়গণ রাজার কাছে সহানুভূতি লাভ করছে কিনা এবং তার গৌরী আস্তানার খবর কি। কায়েস এসব সংবাদ সংগ্রহের জন্যই চললো গৌরী অভিমুখে।

কয়েকদিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেলো বনহুরের।

অবসর হলো চতুর্থ দিনে।

এ ক'দিন নূরীও বনহুরের নাগাল পায়নি একটি বারের জন্যও। সব সময় অনুচরদের নিয়ে মেতে ছিলো নানা কাজে। রহমানের সঙ্গে বিভিন্ন দিকে ছুটেছে আস্তানায়। যতক্ষণ আস্তানায় থেকেছে ততক্ষণ দরবারকক্ষে রহমান ও বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচর নিয়ে আলাপ-সালাপে মাতোয়ারা থেকেছে।

নূরী অভিমান করে কাটিয়েছে কিন্তু সে অভিমান ভাঙাবার জন্য বনহুর সময় পায়নি।

আজ বনহুর অবসর পেয়ে আসে তার বিশ্রামাগারে।

নূরী তখন মুখ ভার করে দাঁড়িয়েছিলো। বনহুরের সঙ্গে সে একটি কথাও বলে না।

বনহুর প্রথমে অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলো, নূরীকে লক্ষ্যই করেনি। গা থেকে জামা খুলে শয্যায় এসে বসলো, পা থেকে জুতোটা না খুলেই দেহটা এলিয়ে দিলো শয্যায়। হঠাৎ নজর পড়লো নূরী ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর ডাকলো—নূরী!

নূরী যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি রইলো, কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর বুঝতে পারলো, নূরী রাগ করেছে। উঠে এসে ওর চিবুকটা উঁচু করে ধরলো—মুখ ওমন ভার কেন?

কোনো জবাব দিলো না নূরী।

বনহুর ওর হাত ধরে শয্যার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

নূরী শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, অভিমান যেন আরও গাঢ় হয়ে এলো। কিছুতেই সে এক চুল নড়লো না।

বনহুর ওকে দু'হাতের উপর তুলে দিলো শূন্যে। তারপর নিয়ে এলো খাটের পাশে, হেসে বললো—এবার হলো তো?

যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। বললো নূরী।

বনহুর ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললো—বেশ, আমিও বলবো না।

বনহুর মুখ ভার করে বসে পড়লো এক পাশে।

নূরী এবার না হেসে পারলো না, বনহুরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো—সবাইকে তো অনেক দিলে, আমাকে কি দিয়েছো বলো?

তার মানে?

মানে ভেবে দেখো!

সবই তো তোমার, যা খুশি নাও, মানা নেই। মণি-মুক্তা-হীরা.....

ও সব আমি চাই না।

কি চাও তবে?

তোমাকে।

হো হো করে হেসে উঠলো বনহুর—কেনো আজও তুমি আমাকে পাওনি?

পেয়েছি কিন্তু.....

কি বলো?

না, বলবো না।

উঁ হুঁ, বলতে হবে তোমাকে?

না, বলবো না।

তা বলবে কেন! আমি মেয়েদের কোনোদিনই বিশ্বাস করি না, কারণ আমি জানি, তারা জীবন গেলেও মনের কথা প্রকাশ করে না। যেমন তুমি আমাকে বলো, আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি কিন্তু আসলে মনের সামান্য কথাটাও কোনোদিন অন্তর খুলে প্রকাশ করোনা। কাজেই তোমার ভালবাসা শুধু অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। যে যাকে ভালবাসে তার কাছে কোনোদিনই মনের কথা গোপন করা উচিত নয়।

নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বলে—তুমি না বলেছিলে আমাকে একটি সন্তান দেবে?

ও এই কথা.....বনহুর নূরীর মুখখানা তুলো ধরলো, মৃদু হেসে চাপা কণ্ঠে বললো—আজও বলছি দেবো, দেবো তোমাকে।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো নূরীর গণ্ড দুটি।

বনহুর ওকে আবেগভরে টেনে নিলো আরও গভীর ভাবে।

নূরী বনহুরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বললো—ছেড়ে দাও আমাকে।

কেন?

বলো আজ ক'দিন হলো এসেছো?

ঠিক চার-পাঁচ দিন হবে।

দিনরাত অপরের মঙ্গল চিন্তা নিয়েই ভেবেছো কিন্তু তোমার নিজের মঙ্গলটা একবার ভেবেছো কোন সময়?

নিজের মঙ্গল? তোমার কথা ঠিক্ বুঝতে পারছি না নূরী? বলো, কি আমার মঙ্গল?

কার ঘরে খাবার নেই, কার ঘরে অভাব-অভিযোগ, কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কার স্বামী স্ত্রীর প্রতি অসৎ আচরণ করছে, তাকে নিয়ে এসে সাজা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছো আর তোমার নিজের দিকটা একবার ভেবে দেখেছো?

হেঁয়ালি ভরা কথা রেখে ভাল করে বলো নূরী?

ভাল করেই বলছি, ভেবে দেখলেই বুঝতে পারো। কত দিন তুমি মনিরা আপার সঙ্গে দেখা করোনা বলো তো? তুমি জানো না, স্ত্রীর কাছে স্বামী কত বড়.....

নূরীর কথায় বনহুর আনমনা হয়ে যায়, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—সত্যি নূরী, আমি মনিরার কাছে অপরাধী! শুধু মনিরার কাছেই নয়, মায়ের কাছেও। পাপিষ্ঠ সন্তান আমি, চিরদিন মাকে শুধু ব্যথাই দিয়ে এলাম, সুখী করতে পারলাম না কোনোদিন। .....বাষ্পরুদ্ধ হয় এলো বনহুরের গলার স্বর।

নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে—তুমি যাও হুর, তোমার মা, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এসো। তোমার মনি কতদিন তোমাকে ছাড়া রয়েছে। তুমি পিতা, তোমার কর্তব্য সন্তানকে মানুষ করা।

নূরী, পারলাম না, জীবনে পারলাম না কাউকে সুখী করতে। সভ্য সমাজে নিজেকে মানুষ বলে পরিচিত করতে পারলাম না। মানুষ হয়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে আমার কত সঙ্কোচ, কত দ্বিধা যদি তুমি বুঝতে নূরী, যদি তুমি বুঝতে.....হাতের মধ্যে মুখ রেখে হু হু করে কেঁদে উঠে বনহুর ছোট ছেলের মত।

নূরী বনহুরের চুলে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তার নিজেরও চোখ দুটো অশ্রু ভরে এলো। তবু নিজেকে সংযত করে বললো—হুর, তুমি

বড্ড অবুঝ কিন্তু! তুমি জানো না, সভ্য সমাজের মানুষগুলোর চেয়ে তুমি কত বড়; কত উঁচুতে। তাই তো তুমি পারো না ওদের পাশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। সভ্য সমাজের মানুষ নামধারী মানুষগুলো সত্যি কি মানুষ। তুমিই না একদিন বলেছিলে হুর, ওরা মানুষ নামে অমানুষ। বিড়ালতপস্বী সেজে মানুষ হয়ে মানুষের রক্ত শুষে নেয় ওরা। হুর, তুমি কত মহৎ, কত মহান! নিজের জন্য তুমি এতোটুকু ভাবোনা, সব সময় তোমার চিন্তা পরের মঙ্গল নিয়ে। বলো, কে মানুষ—তুমি না তারা?

নূরী, তুমি যা বলছো মিথ্যে নয় কিন্তু.....

না কোনো কথা তোমার শুনতে চাই না হুর। তুমি মনিরা আপার ওখানে যাবে কিনা বলো?

যাবো।

উঠো তাহলে।

এক্ষুণি?

হাঁ এক্ষুণি। চলো আমি তোমাকে তৈরি করে দি।

নূরী বনহুরকে সাজিয়ে দিলো নিজের হাতে।

তারপর নূরী নিজের কণ্ঠ থেকে খুলে নিলো বনহুরের দেয়া হীরক হারটি। এ হার বনহুর নূরীকে জাহাজে উপহার দিয়েছিলো।

বনহুরের হাতে হারছড়া খুলে দিয়ে বললো—হুর তুমি আমাকে এ হার উপহার দিয়েছিলে, আমি এটা মনিরা আপাকে দিলাম।

বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নূরীর মুখের দিকে। জলোচ্ছ্বাসের তলা হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত রত্নসিন্দুকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যে হার সুন্দর এবং মূল্যবান সেই হীরক হার বনহুর নূরীকে পরিয়ে দিয়েছিলো আপন হাতে। ঐ দিন নূরী যেমন খুশি হয়েছিলো তেমন খুশি বুঝি সে কোনোদিন হয়নি। আজ সেই হার নূরী খুশিভরা মনে তুলে দিলো বনহুরের হাতে মনিরাকে দেবার জন্য। বনহুরকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে হেসে বললো নূরী—কি দেখছো?

এটা তুমি মনিরাকে দিচ্ছো?

হাঁ, নিয়ে যাও। আমার প্রিয় জিনিসটা তাকে দিয়ে আমি আনন্দ পাবো।

বেশ। তুমি যদি খুশি হও, আনন্দ পাও, তাহলে আমিও খুশি হবো।

বনহুরকে তাজের পিঠে তুলে দিয়ে ফিরে এলো নূরী। শূন্য বিছানায় শুয়ে বনহুরের বালিশটা টেনে নিলো বুকের কাছে, চোখ দুটো মুদে এলো ওর গভীর আবেগে।

❑

নূর বাগানে খেলা করছিলো।

বনহুর বাগানের আড়ালে তাজকে রেখে বাগানে প্রবেশ করলো। পিছন থেকে নূরকে তুলে নিলো কোলে।

চমকে উঠলো নূর তারপর বনহুরের মুখে দৃষ্টি পড়তেই আনন্দধ্বনি করে উঠলো—আব্বু.....

বনহুর নূরকে ভালভাবে কোলে তুলে দিয়ে ওর নরম গালে ছোট্ট চুমু দিয়ে বললো—কেমন আছো নূর?

ভাল আছি আব্বু। বলো এতোদিন কেন আসোনি?

বলেছি তো অনেক কাজ আমার।

তুমি কোথায় থাকো আব্বু? কি এতো কাজ তোমার? একদিন আমাকে নিয়ে যাবে তোমার ওখানে?

যাবো। কিন্তু অনেক দূরে, পারবে যেতে?

কেন পারবো না? আমি এখন অনেক বড় হয়েছি। যেতে পারবো তোমার সঙ্গে।

আচ্ছা, একদিন তোমাকে নিয়ে যাবো। চলো, তোমার আম্মির কাছে যাই।

চলো আব্বু। আম্মি সব সময় তোমার কথা বলে।

তাই নাকি?

না, কোনো সময় তোমার কথা বলিনা। মিথ্যা কথা বলেছে নূর। পিছন থেকে বলে উঠলো মনিরা।

চমকে ফিরে তাকায় বনহুর আর নূর।

বনহুর নির্বাক দৃষ্টি তুলে তাকায় মনিরার দিকে।

মনিরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—নেমে আয় নূর। বলছি ওর কোল থেকে নেমে আয়।

নূর আরও গাঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে বনহুরের গলা তার কচি বাহু দুটি দিয়ে।

মনিরা বলে—নেমে এসো নূর।

না।

ও তোমার কেউ নয় বলছি। নেমে এসো।

আমার আব্বু.....

মনিরা অভিমান ভরা গলায় বললো—তোমার আব্বু যদি হবে তবে তোমার কাছে থাকতো সে। তোমাকে ছেড়ে অমন করে পালিয়ে যেতো না সে।

নূর বনহুরের কোল থেকে নেমে মায়ের হাত দু'খানা চেপে ধরে—আম্মি, তুমি আব্বুকে বকোনা। আব্বুকে বকোনা আম্মি.....আমার আব্বু কত ভাল.....

ভাল না ছাই।

বনহুর দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলো, নূরকে বললো এবার সে—তোমার আম্মি অনেক ভাল, আমি বড্ড খারাপ, একদম বিশ্রী ছাই-এর মত কালো, তাই না নূর?

না, তুমি অনেক সুন্দর, কত ফর্সা.....

বনহুর নূরের হাত ধরে বললো—তুমি যখন আমাকে ভাল বলছো তখন চলো ভিতরে যাই। তোমার আম্মি আমাকে ভিতরে ডাকবে না।

নূর বনহুরের হাত ধরে বললো—চলো আব্বু।

বনহুর নূরের হাত ধরে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলো।

মনিরা তাকে অনুসরণ করলো।

নূর পিতাকে নিয়ে মরিয়ম বেগমের কক্ষে প্রবেশ করলো। দাদীমা, দাদীমা, দেখো কে এসেছে।

মরিয়ম বেগম কি যেন করছিলেন ফিরে তাকাতেই পুত্রমুখে নজর পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন—মনির এসেছিস বাবা.....

বনহুর এগিয়ে গিয়ে মায়ের কদমবুসি করলো, তারপর হেসে বললো—ভাল ছিলে মা?

ছিলাম। কিন্তু কতদিন হলো তোকে দেখি না বল্‌তো বাবা? জানিস তো তোকে না দেখে আমার কেমন লাগে?

মা, তোমার অধম সন্তান আমি, জানি তুমি আমাকে না দেখে অনেক কষ্ট পাও। মা তবু পারিনা তোমার কষ্ট দূর করতে। তোমার ব্যথা দূর করার মত সামর্থ আমার নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করো মা.....

ইচ্ছা করে তুই আমাকে কষ্ট দিবি, ব্যথা দিবি আর আমি তোকে ক্ষমা করবো। মনির, আজও তুই মানুষ হলি না....

নূর মরিয়ম বেগমের হাত মুঠায় চেপে ধরে—দাদীমা, তুমিও আব্বুকে বকছো? আম্মি বকলো, তুমিও যদি বকো তা হলে আব্বু আর আসবেনা।

বনহুর নূরকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে—বকতে দাও নূর। বকতে দাও।

আব্বু, ওরা তোমাকে কেউ ভালবাসে না, তাই না?

হাঁ, ওরা আমাকে ভালবাসে না। শুধু তুমি আমাকে বড্ড ভালবাসো, বড্ড আদর করো, তাই না নূর?

অনেক ভালবাসি।

ততক্ষণে মনিরাও এসে দাঁড়িয়েছে শাশুড়ীর পাশে মুখ অভিমানে ভার করে বললো এবার সে—অতো দরদ দেখাতে হবে না। বলো এতোদিন কেন আসোনি তুমি?

বলেছি তো অনেক কাজ ছিলো।

মরিয়ম বেগম বুঝলেন, এবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমানের পালা শুরু হলো। তিনি নাতিকে টেনে নিয়ে বললেন—চল, আমরা ততক্ষণে আব্বুর জন্য নাস্তা তৈরি করে আনি।

চলো দাদীমা, আব্বুর বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই না?

হাঁ, চল্ দাদু চল্.....

মরিয়ম বেগম নূরের হাত ধরে বেরিয়ে যান কক্ষ থেকে রান্নাঘরের দিকে।

মা আর নূরের চলে যাওয়া পথের দিকে উঁকি দিয়ে বনহুর দেখে নিলো তারপর দ্রুত এগিয়ে মনিরাকে জাপ্‌টে ধরে গভীর আবেগে চুম্বন দিলো ওর রাঙা দুটি ঠোঁটে, চিবুকটা উঁচু করে ধরে বললো—রাগ করো না লক্ষ্মীটি!

ছাড়ো, ওসবে মন আমার ভোলে না। কি কথা দিয়েছিলে মনে আছে? অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো মনিরা।

বনহুরের বাহুবন্ধন এতোটুকু শিথিল হলো না। বরং আরও নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললো—কি কথা, স্মরণ করিয়ে দাও তাহলেই মনে পড়বে?

সব ভুলে গেছো! তা ভুলবেই তো, আমি তোমার কে.....বাষ্পরুদ্ধ হঁয়ে আসে মনিরার কণ্ঠ।

বনহুর মৃদু হেসে বলে উঠে—তুমি আমার স্ত্রী। তোমার কথা ভুললেও তোমাকে ভুলিনি কোনো দিন।

স্বামীর কথায় অভিমান আরও বেড়ে যায় মনিরার, বলে সে—যাও, অমন মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আমার। যে কথা দিয়ে কথা রাখে না সে মানুষ নয়।

হেসে বলে বনহুর—কি কথা দিয়েছিলাম একটিবার স্মরণ করিয়ে দাও লক্ষ্মীটি?

তুমি না বলেছিলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারী হবে?

ওঃ এই কথা। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সত্যি মনিরা, এবার সংসারী হবো।

তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

মনিরা, তুমি সব জেনেও কেন এতো অবুঝ হও বলো তো? অযথা অভিমান করো তুমি আমার উপর।

আমি তো নারী, আমার কি সাধ হয় না স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করি!

মনিরা, তুমি যদি বুঝতে আমার মনের কথা! তোমার মতই আমারও সখ হয়, সাধ হয় স্ত্রী-পুত্র-মাকে নিয়ে একটা ছোট্ট সংসার গড়ে তুলি, কিন্তু পারি না.....

সে দোষ তোমার নিজের, অপরের নয়।

হাঁ, আমার নিজের দোষ স্বীকার করি। যখনই ভাবি, এবার তোমাদের নিয়ে সংসারী হবো তখনই আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে শত শত

অসহায় নরনারীর করুণ মুখ। পারি না তখন, পারি না আমি নিজেকে সংযত রাখতে, ছুটে যাই তাদের ডাকে সাড়া দিতে।

আমি কি তা বুঝি না? সব জানি, সব বুঝি। চিরদিন তুমি এমনি করে দূরে থাকবে আর আমি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবো। কেন, সংসারী হলে কি পারবে না পরের উপকার করতে? তোমার অসহায় ভাই-বোনদের জন্য আমিও তো একজন তোমার সঙ্গিনী।

তা জানি। মনিরা, তুমি আমার সঙ্গিনীই শুধু নও, আমার ভরসা তুমি। মনিরা, আমি তোমার যোগ্য স্বামী নই, আমি অপরাধী.....

ছিঃ এসব তুমি কি বলছো?

সত্যি আমি বড় অপরাধী, একটা কথা আমি তোমাকে বলতে চাই মনিরা? যদি অভয় দাও তো.....

কোনো কথা আমি শুনতে চাই না তোমার। বলো এবার তুমি সংসারী হবে কিনা?

মনিরা!

না, আর আমি কিচ্ছু শুনবো না, মানবো না। আমার কথা যদি না রাখো তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো। আর সে জন্য দায়ী হবে তুমি.....

মনিরা মাফ করো, মাফ করো আমাকে। কথা দিয়েছি, আবার দিচ্ছি সত্যি আমি তোমাদের নিয়ে সংসারী হবো।

এতোক্ষণে মনিরার মুখে হাসি ফুটলো, স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বললো—আমাকে বাঁচালে!

বনহুর মনিরার চিবুকটা তুলে ধরলো—হাসো, হাসো তাহলে। তোমার মুখে হাসি দেখতে চাই মনিরা।

স্বামীর কথায় হাসি ফুটলো মনিরার ঠোঁটের কোণে।

বনহুর বললো—মনিরা, একটি বার চোখ বন্ধ করো।

কেনো?

পরে বলবো। আগে চোখ বন্ধ করো।

মনিরা চোখ বন্ধ করে দাঁড়ালো।

বনহুর নূরীর দেয়া হীরক হারছড়া পরিয়ে দিলো মনিরার গলায়।

মনিরা চোখ খুললো, সঙ্গে সঙ্গে নিজ গলায় হীরক হারে দৃষ্টি পড়তেই আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো। খুশিতে আত্মহারা হয়ে বললো—কি সুন্দর!

পছন্দ হয়েছে তোমার?

খুব। মনিরা হারছড়া উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো। চোখেমুখে তার আনন্দ উচ্ছ্বাস।

বললো বনহুর—খুশি হয়েছো?

না।

বলো কি মনিরা?

হাঁ, এ হারের চেয়ে আমি বেশি খুশি হবো, যদি তুমি আমার পাশে থাকো।

এমন সময় মরিয়ম বেগম নূরসহ খাবার ট্রে হাতে কক্ষে প্রবেশ করে।

মনিরা আনন্দে উচ্ছল হয়ে এগিয়ে যায় মরিয়ম বেগমের পাশে—মামীমা দেখো, তোমার ছেলে কি এনেছে!

মরিয়ম বেগম মনিরার গলায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খুশি হন এবং আনন্দবিগলিত কণ্ঠে বলেন—ভারী সুন্দর তো হারছড়া, কি সুন্দর মানিয়েছে মা তোর গলায়!

নূর অবাক হয়ে মায়ের গলার হাত নেড়েচেড়ে দেখে, বলে সে—আব্বু, এ হার তুমি কোথায় পেয়েছো?

কুড়িয়ে পেয়েছি।

অবাক কণ্ঠে বলে উঠে নূর—কুড়িয়ে এতো সুন্দর হার পাওয়া যায়?

হাঁ, আরও সুন্দর জিনিস কুড়িয়ে পাওয়া যায়।

মরিয়ম বেগম বললেন—সত্যি তুই এ হার কুড়িয়ে পেয়েছিস্ মনির?

হাঁ মা, তবে শুকনো মাটিতে নয় গভীর সমুদ্র তলে।

অস্ফুটধ্বনি করে উঠে মনিরা—সমুদ্রতলে?

হাঁ, ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের অতল থেকে ওটা উদ্ধার করা হয়েছে।

মরিয়ম বেগম বিস্ময়ভরা গলায় বললেন—এসব কি বলছিস্ বাবা?

এ গল্পটা আমি তোমাদের শোনাবো। আগে দাও দেখি আমার জন্য কি খাবার এনেছো মা?

এই নো বাবা, এই নে। মরিয়ম বেগম পুত্রের সম্মুখে খাবারগুলো সাজিয়ে রাখলেন।

মনিরা পরিবেশন করতে লাগলো, বললো—মামীমা, তুমি বসো, আমি সব দেখেশুনে দিচ্ছি।

বনহুর নূরকে টেনে নিলো কোলের মধ্যে—এসো আব্বু, আমরা দু'জন মিলে খাই, কেমন?

নূর মাথা দুলিয়ে বললো—আচ্ছা।

খেতে খেতে সাঁপুড়ে সর্দারের কাহিনী থেকে ফারহানের হাত থেকে রত্নভরা সিন্দুকগুলো উদ্ধারের কথাগুলো পর্যন্ত সব সংক্ষেপে বললো বনহুর।

মা আর মনিরার চক্ষুস্থির, শুধু অবাক বা হতভম্ব নয়, একেবারে তারা বাকশক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে। ছাই এর মত বিবর্ণ আর ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে উভয়ের মুখ। নূর কিন্তু বিপুল আগ্রহ নিয়ে শুনে যাচ্ছিলো, যদিও সে সব বুঝতে পারছিলো না তবু তার চোখে মুখে বিস্ময়।

মরিয়ম বেগম আর্তস্বরে বললেন—কোন্ সাহস নিয়ে তুই ঐ ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে নেমেছিলি? যদি কোন অমঙ্গল ঘটতো..

একটু হাসলো বনহুর তারপর বললো—জানি মা তুমি সব সময় আমার জন্য মঙ্গল কামনা করছো তাই তো অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।

ওরে হতভাগা, কোথায় কবে তুই নিঃশেষ হয়ে যাবি সেদিন আমার সব আশার প্রদীপ নিভে যাবে, ওরে আমি জানতেও পারবোনা।

মায়ের দোয়া যেখানে, সেখানে কোনো ভয় নেই। মা তুমি কোন সময় দুশ্চিন্তা করোনা তোমার ছেলে ভালই থাকবে। নূর কি বলো সত্যি না?

নূর মাথা দোলায়।

মনিরা কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে পড়েছে, সে একটি কথাও বলছে না। কারণ সে জানে তা স্বামী শুধু দুঃসাহসী দুর্দ্দান্তই নয় যেমন শক্তিশালী তেমনি ভয়ঙ্কর কিন্তু এমন কাণ্ড সে করবে বা করতে পারে ভাবতে পারিনি কোনদিন। ইচ্ছা হলো মনিরার হার ছড়া ছুঁড়ে ফেলে দেয় আবর্জনার মধ্যে কিন্তু মামীমার সম্মুখে ধৈর্য ধরে চুপ চাপ বসে বসে শুনে যেতে লাগলো। মৃত্যুর মুখে নিজেকে বিসর্জন করে কি প্রয়োজন ছিলো এ সব উদ্ধার করতে যাওয়ার। ফারহান যেভাবে তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলো যদি সত্যি তার

মৃত্যু ঘটতো। তাহলে আর কোনোদিন স্বামীকে সে ফিরে পেতোনা.....কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠলো মনিরা।

সমস্তদিন কাটলো, রাতে স্বামীকে পেলো মনিরা একান্ত নিভৃতে। নূর থাকতো তার দাদীমার কাছে তাই এ ঘরে মনিরা একাই শোয়, প্রতিদিন প্রতিক্ষা করে স্বামীর আগমনের। শূন্য বিছানায় ছট্‌ফট্ করে, আজ কতদিন পর স্বামীকে পেয়েছে মনিরা পাশে।

মনিরা বিছানায় শুয়ে চুপ করে রইলো ওপাশে মুখটি ফিরিয়ে নিয়ে।

বনহুর এতোক্ষণ মা সরকার সাহেব আর নূরের সঙ্গে পাশের ঘরে এ কথা সে কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলো, রাত বেড়ে এসেছিলো ধীরে ধীরে।

মনিরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলো কতক্ষণে আসবে সে, যার জন্য তার মন প্রাণ চঞ্চল হয়ে আছে। এক সময় এলো বনহুর মনিরার কক্ষে। আজ তাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো; কে বলবে এই লোকটি সাধারণ মানুষ নয় একজন দুর্দান্ত দস্যু।

সরকার সাহেব মা আর সন্তানকে নিয়ে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো বনহুরের তখন মনিরাও কিছু সময় বসেছিলো সেখানে। সকলের অলক্ষে মনিরা বার বার তাকিয়ে দেখছিলো স্বামীর দীপ্ত উজ্বল মুখ, কত সুন্দর কত সচ্ছ স্বাভাবিক সে মুখ। যত রাগ অভিমান সব মুছে যায় ও মুখের দিকে তাকালে।

মনিরার দু'চোখ ছাপিয়ে পানি ভরে আসতে চাইছিলো। তখন সে আর বসে থাকতে পারেনি, চলে গিয়েছিলো নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে পড়েছিলো গিয়ে, কিন্তু স্বস্তি আসছিলো না কিছুতেই মনে। আনচান করছিলো মনটা কতক্ষণে আসবে সে এঘরে।

বনহুর মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো তারপর এগিয়ে এলো বিছানার পাশে। মনিরা জেগেই ঘুমের ভান করে রইলো, কোনো সাড়া শব্দ করলো না।

বনহুর বুঝতে পারলো মনিরা ঘুমায় নি, সে ইচ্ছে করেই অমন নিশ্চুপ রয়েছে। একটি ছোট্ট কাঠি নিয়ে মনিরার কানে শুড় শুড়ি দিলো, আর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো সে।

স্বামীর রসিকতায় মনিরার খুব হাসি পাচ্ছিলো কিন্তু না হেসে মুখ ভার করে বললো—আঃ বড্ড বিরক্ত করছো।

তাও ভাল, ঘুমিয়ে পড়নি তা হলে? বনহুর মনিরাকে টেনে নিলো কাছে। বললো আবার—কথা বলছোনা কেন বলো তো?

কি হবে কথা বলে? যাকে ধরে রাখতে পারবো না, তার সঙ্গে মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?

তাই নাকি?

তাই নয় তো কি? চাই না তোমার ঐ হীরক হার। তুমি নিয়ে যাও ওটা।

কেন?

তুমি কোন্ প্রাণ নিয়ে অমন ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে অবতরণ করেছিলে বলো? তোমার জীবনের চেয়েও কি ঐ হীরক-মণি-মুক্তার মূল্য বেশি? আমি জানতে চাই কেন তুমি এমন করে নিজেকে হত্যা করতে চাও?

মনিরার কথায় হেসে বললো বনহুর—মনিরা, যেদিন মৃত্যু আসবে সেদিন কেউ ধরে রাখতে পারবে না। এই কক্ষে বসেও আমার মৃত্যু ঘটতে পারে আবার গভীর জলোচ্ছ্বাসের তলা হতেও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারি, বলো সত্যি কি না?

মনিরা চোখ দুটো তুলে ধরলো স্বামীর মুখে, কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর বলে চললো—আমি তো বলেছি তোমার অপরিসীম ভালবাসা, মায়ের সীমাহীন দোয়া, নূরের অফুরন্ত আকর্ষণ আমাকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে। আরও একজন আমার জন্য দোয়া করে মনিরা.....আনমনা হয়ে যায় বনহুর।

মনিরা অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে উঠে—কে, কে সে?

সে হলো নূরী।

না না, ও নাম তুমি আমার সম্মুখে করো না। আমি ওকে সহ্য করতে পারিনা।

মনিরা, তুমি ওকে যতখানি মনে করো, আসলে সে.....

চুপ করো, চুপ করো, আমি শুনতে চাই না ওর কথা। আমি জানি, নূরী তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়।

তোমার ভুল ধারণা মনিরা, সে তোমাকেও ভালবাসে।

চাই না, চাই না আমি কারো ভালবাসা। বলো তুমি কবে আসছো, কবে সংসারী হয়ে আমার সঙ্গে ঘর বাঁধছো?

কথা দিয়েছি তো, তবে এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তা তো জানো?

কেন?

একদিন সে কথা তোমাকে বলেছি মনিরা, এখানে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ নয় কারণ গোয়েন্দা পুলিশ সদা-সর্বদা চৌধুরীবাড়ির দিকে সুতীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। তারা দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে পারলে এক হাজার দু'হাজার নয়, বিশ হাজার টাকা সরকারের নিকট হতে পুরস্কার লাভ করবে।

তাহলে তুমি কথা রাখবে না আমার?

পুলিশের হাতে আমাকে সমর্পণ করার ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে তোমার কথায় আমি রাজি আছি.....

সত্যিই তুমি তাহলে আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলে?

মিথ্যা নয় মনিরা, ঘর আমি বাঁধবো তোমাকে নিয়ে কিন্তু এ বাড়িতে নয়, তোমার জন্য আমি কান্দাই শহরে একটি বাড়ি তৈরি করে দেবো, সেখানে শুধু তুমি আর আমি.....মা আর নূর থাকবে এখানে।

সত্যি বলছো.....এতোক্ষণে হাসি ফোটে মনিরার ঠোঁটের কোণে।

বনহুর মনিরাকে আরও নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে—সত্যি বলছি।

❑

বনহুর যখন নির্জন কক্ষে মনিরার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আবেগভরা কণ্ঠে কথাবার্তা বলছিলো তখন তাজ আপন মনে বাগানবাড়ির পিছনে একটা ঝোপের পাশে ঘাস খাচ্ছিলো, আর মাঝে মাঝে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় কান দুটোকে সতর্কভাবে এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছিলো। কখন সে শুনতে পাবে প্রভুর সঙ্কেৎপূর্ণ শীসের শব্দ।

এদিকে রাত প্রায় ভোর হয়ে আসছে, নিদ্রাহীন যেন দুটি কপোত-কপোতী বনহুর আর মনিরা। কত সাধনার পর স্বামীকে আজ একান্ত পাশে পেয়েছে, কিছুতেই তাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছিলো না মনিরার।

বনহুর ভোর হবার পূর্বে আস্তানায় ফিরে যাবার জন্য বার বার মনিরার কাছে বিদায় চাইছিলো কিন্তু মনিরা কিছুতেই তাকে ছেড়ে দেয়নি। নিবিড়ভাবে ধরে রেখেছে সে ওকে। চুলে হাত বুলিয়ে এ কথা-সে কথা বলে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে।

এখানে বনহুর আর মনিরা যখন গভীর আবেগে মগ্ন ঠিক ঐ মুহূর্তে একজন পাহারাদার পুলিশের দৃষ্টি এসে পড়ে তাজের উপর। তাজকে দূর থেকে দেখে তার মনে সন্দেহ জাগে। কারণ পুলিশ মহলের সবাই জানে, দস্যু বনহুরের সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির নিগুঢ় একটা সম্বন্ধ আছে। পাহারাদার পুলিশটির চোখ দুটো জ্বলে উঠলো; সে বুঝতে পারলো, এ অশ্ব অন্য কারো নয় দস্যু বনহুরের ছাড়া। দ্রুত সে একটি ফোন অফিসে গিয়ে সোজা পুলিশ অফিসে ফোন করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ফোর্স এসে ঘিরে ফেললো চৌধুরীবাড়ি।

সরকার সাহেব নিচের কামরায় ঘুমাতেন, তিনি টের পেয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন। তাড়াতাড়ি মনিরার দরজায় মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললেন—ছোট সাহেব, পুলিশ ...পুলিশ এসেছে.....

মনিরা আর বনহুর জেগেই ছিলো।

বনহুর দ্রুতহস্তে দরজা খুলে ধরতেই সরকার সাহেব চাপা স্বরে বলে উঠলেন—পুলিশ সমস্ত বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে, শীঘ্র পালান ছোট সাহেব.....

বনহুরের মুখে অসহায় চোখে তাকালো মনিরা। তারই জন্য এই বিপদ ঘটলো, কি করবে এখন সে!

বনহুর মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো—মা আর নূরের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হলো না! চললাম, খোদা হাফেজ.....

বনহুর কথা শেষ করেই এগিয়ে গেলো বেলকুনি ধরে গাড়ি বারান্দার ছাদের দিকে।

পুলিশ ফোর্স তখন সমস্ত বাড়ি ঘেরাও করে ফেলছে, কতগুলো সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ইন্সপেক্টার অন্দরমহলে প্রবেশ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে উপরে। প্রত্যেকটা ঘরের দরজায় দু'জন করে পুলিশ পাহারা রইলো। ইন্সপেক্টার ছুটোছুটি করে এ ঘর-সে ঘর সন্ধান করে ফিরতে লাগলো।

ওদিকে পুলিশগণ বাড়ির চারপাশে গুলী ভরা রাইফেল নিয়ে সতর্ক পাহারা দিচ্ছে।

সেই মুহূর্তে গাড়ি-বারান্দার ছাদে এসে দাঁড়ালো বনহুর। নিচে তাকিয়ে দেখলো, অন্ধকারে অসংখ্য পুলিশ পিঁপীলিকার মত বাড়িটার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর দেখলো, গাড়ি-বারান্দার আশেপাশে কোনো পুলিশ নেই। কারণ গাড়ি-বারান্দা ছিলো সম্পূর্ণ শূন্য ঝুলন্ত বেলকুনি, কোন থাম বা পিলার ছিলো না। পুলিশ ফোর্স তাই এদিকে নজর রাখা প্রয়োজন মনে করেনি, তারা প্রত্যেকটা দেয়ালের পাশে রাইফেল বাগিয়ে কড়া পাহারা দিচ্ছে। দস্যু বনহুর যেন দেয়াল বা জলের পাইপ বেয়ে নিচে নেমে না পালায়।

বনহুর গাড়ি-বারান্দার বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের ফাঁকে দুটি আংগুল রেখে খুব জোরে শিস্ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে তাজ এসে দাঁড়ালো গাড়ি-বারান্দার নিচে। বনহুর এক সেকেণ্ড বিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়লো তাজের পিঠে। তারপর উল্কা বেগে ছুটলো।

ঘোড়ার খুরের দ্রুত শব্দ কানে যাওয়ায় পুলিশ ফোর্সের চমক ভাঙ্গলো, তারা শব্দ লক্ষ্য করে রাইফেলের গুলী ছুঁড়তে লাগলো। একটি নয়, পরপর গুলীর গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে চৌধুরীবাড়ির চারপাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

অন্তঃপুরে মনিরা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। মরিয়ম বেগম পাষাণ মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছেন, তিনি হতবাক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন যেন। কি করবেন, কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

বাড়ির সবাই জেগে গেছে চাকরবাকর থেকে বাড়ির কুকুরটা পর্যন্ত জেগে উঠেছে। কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। কুকুরটা অবিরত ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। সরকার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন মরিয়ম বেগমের পাশে, কখন তিনি ধৈর্যচ্যুত হয়ে কি করে বসেন কে জানে।

একদল পুলিশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ইন্সপেক্টরকে লক্ষ্য করে ব্যস্তকণ্ঠে বললো—স্যার, দস্যু বনহুর পালিয়েছে....পালিয়েছে.....

এতোক্ষণ মরিয়ম বেগম জীবিত আছেন না মরে গেছেন সে অনুভবটুকু যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। যখন তাঁর কানে গেলো দস্যু বনহুর পালিয়েছে তৎক্ষণাৎ তাঁর দেহে প্রাণ ফিরে এলো। তিনি দু'হাত তুলে ধরলেন খোদার দরগায়—হে রহমানুর রহিম, আমার নয়নের মনিকে তুমি রক্ষা করেছো, হাজার শুকরিয়া তোমার দরগায়.....

পুলিশ ফোর্স বিমুখ হয়ে ফিরে গেলো।

ইন্সপেক্টর যাবার সময় কয়েকজন পুলিশ চৌধুরীবাড়ীর পাহারায় রেখে গেলেন।

মনিরার মুখে হাসি, চোখে অশ্রু নিয়ে ছুটে গেলো গাড়ি-বারান্দার শূন্য বেলকুনির ধারে, যেখান থেকে তার স্বামী অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়ে পুলিশবাহিনীর দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলো। মনিরা দু'হাতে বেলকুনির রেলিংখানা চেপে ধরলো, আনন্দের আতিশয্যে গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো তার আনন্দ অশ্রু।

❑

বনহুরের দরবারকক্ষ।

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট দস্যু বনহুর।

রহমান তার পাশে দণ্ডায়মান।

কয়েকজন সশস্ত্র অনুচর দরবারকক্ষের দরজায় পাহারারত।

রহমানের সম্মুখে ওয়্যারলেস মেশিনের সাউণ্ডবক্স। বনহুরের বিভিন্ন আস্তানা থেকে তার অনুচরগণ সংবাদ পাঠাচ্ছে। কোথায় কি অবস্থা, সেখানের লোকজনের অবস্থা কেমন, কোথায় কি ঘটেছে বা ঘটছে সব সংবাদ এক এক করে এসে পৌঁছাচ্ছে বনহুরের দরবারে।

ওয়্যারলেসের সাউণ্ড বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, কাজেই দরবারকক্ষের সবাই শুনতে পাচ্ছে ওদের কথাগুলো। দরবার কক্ষে সবাই নিশ্চুপ হয়ে শুনে

যাচ্ছে। বনহুর নিজেও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছে সব কথা।

রহমান ওয়্যারলেসে মাঝে মাঝে পাল্টা জবাব দিচ্ছে।

গোরী আস্তানা থেকে কায়েস কথা বলছে এবার। গোরী আস্তানার সংবাদ জানানোর পর গোরী অধিবাসিগণের অবস্থা জানালো কায়েস! তারপর বললো, আর একটি সংবাদ আছে—অতি রহস্যময় সংবাদ.....

বনহুর আর রহমান সরে এলো ওয়্যারলেসের পাশে।

রহমান ওয়্যারলেস মাইকে মুখ রেখে বললো—কি সংবাদ কায়েস বলো? কি রহস্যময় সংবাদ.....

কায়েসের গলার আওয়াজ.....কিছুদিন হলো গোরী রাজ্যে এক বিস্ময়কর ঘটনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। গোরী রাজ্যের অদূরে তেরান নদীর ধারে যে পোড়ো বাড়িতে রাণী দুর্গেশ্বরীকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছে, সে বাড়ির মধ্যে গভীর রাতে করুণ কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। কখনও কখনও সে বাড়ির ছাদে দেখা যায় শুভ্রবসনা এক নারীমূর্তি.....কিন্তু কেউ তাকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। কৌতুহলবশতঃ কোনো ব্যক্তি সে পোড়োবাড়িতে প্রবেশ করলে সে আর ফিরে আসে না। পরে পুলিশগণ সে পোড়োবাড়ি সার্চ করেও মৃত বা জীবিত ব্যক্তিকে খুঁজে পায় না.....পুলিশ মহল নানাভাবে অনুসন্ধান চালিয়েও রহস্যভেদ করতে সক্ষম হয়নি অনেকে বলছে, শুভ্রবসনা নারীমূর্তি অন্যকিছু নয়, রাণী দুর্গেশ্বরীর অশরীরী আত্মা.....

বনহুর কথাটা শুনে হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে, তারপর বললো—রাণী দুর্গেশ্বরীর প্রেতাত্মাই বটে...

রহমান ও দরবারকক্ষের অন্যান্য সবাই বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সর্দারের মুখের দিকে।

রহমান বললো—সর্দার, আমার মনে হয় গভীর কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ পোড়োবাড়ির মধ্যে।

রহস্য তো বটেই, রাণী দুর্গেশ্বরীকে জীবন্ত সমাধিস্থ করার পূর্বে সে ঐ স্থানে নিজেকে কবর দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলো, না?

হাঁ সর্দার। সে বলেছিলো আমাকে জীবন্ত কবর দাও তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ আমাকে যেন গোরীর তেরান নদীর ধারে ঐ পোড়োবাড়ির একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমাধিস্থ করা হয়। গোরী মহারাজ স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেননি।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—হুঁ বুঝলাম। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে পুনরায় বললো বনহুর—রহমান, কায়েসকে জানিয়ে দাও, আমি অচিরেই গোরী আস্তানায় রওয়ানা দিচ্ছি। যে অর্থ সে নিয়ে গেছে যদি শেষ হয়ে থাকে তবে কিছু অর্থ সঙ্গে নিতে হবে, কাজেই সে কথাও জেনে নেবে। গোরীর অনাথ অসহায়দের যেন কোনো অভাব না থাকে।

রহমান বললো—আচ্ছা সর্দার, জানিয়ে দিচ্ছি।

বনহুর তখনকার মত দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে বিশ্রামকক্ষের দিকে এগুলো।

বনহুর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করতেই নূরী উচ্ছ্বল ঝরণার মত আনন্দ উচ্ছ্বাসে ঝরে পড়ছে।

বনহুর নূরীর চিবুকে মৃদু চাপ দিয়ে বললো—কেমন ছিলে?

বনহুরের জামার বোতাম খুলে দিতে দিতে বললো নূরী—প্রাণহীনের মত।

আর এখন?

বর্ষার আগমনে বসুন্ধরা যেমন সজীব হয়ে উঠে তেমনি।

চমৎকার কবিত্ব শিখেছো নূরী—অপূর্ব.....এতো কথা তুমি শিখলে কোথায়?

তোমার কাছে।

আমার কাছে, মানে?

তোমার প্রেম, তোমার ভালবাসা আমাকে অজানার সন্ধান দিয়েছে বনহুর। তোমাকে পেয়ে আমি মুখর হয়ে উঠেছি.....

বনহুর নূরীকে আকর্ষণ করে বলে—উচ্ছ্বল ঝরণার মত—তাই না?

হাঁ, হুর, তোমার প্রেম আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা, আমার সব কিছু.....নূরীর চোখ দুটো মুদে আসে গভীর আবেগে।

এমন সময় রহমান দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে—সর্দার!

বনহুর নূরীকে বাহুমুক্ত করে দিয়ে বলে—এসো।

রহমান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।

বনহুর ফিরে তাকায়—কি খবর রহমান?

গোরী রাজ্যে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবো কি সর্দার?

হাঁ, তৈরি হয়ে নাও। কিছু অর্থ আর খাদ্যদ্রব্য নিও। আর নিও প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ।

নূরী চমকে উঠলো যেন, মুহূর্তে মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো, গোরীরাজ্যে যাবার কথা শুনে নয় প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ নেয়ার কথাটা কানে যেতেই আতঙ্কিত হলো নূরীর মন।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

নূরী বিবর্ণ মুখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, ব্যথাকরুণ কণ্ঠে বললো—গোরীরাজ্যে আবার কি প্রয়োজন হলো তোমার?

সবকথা তোমার না শোনাই ভাল নূরী?

কেন?

তুমি ছেলেমানুষ কিনা তাই।

আমি ছেলেমানুষ!

তা নয় তো কি?

জানো আমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি? দশ জোয়ান যা পারে না, আমি তা করতে সক্ষম হই.....

তাই নাকি?

হাঁ। আমি ছেলেমানুষ নই, একথা ভুলে যেও না।

তাহলে বীরাঙ্গনা তুমি? দশ জোয়ান যা পারে না তুমি তখন তাই পার। তোমাকে দেখে আমার কিন্তু বড্ড ভয় পাচ্ছে.....

নূরী নিজের ওড়না দিয়ে বনহুরের গলা জড়িয়ে টেনে ধরে—বলো আর আমাকে ছেলেমানুষ বলবে না? বলো?

—না বলবো না। বলবো না বলছি, ছেড়ে দাও?

—কান ধরো। কান ধরো বলছি তাহলে.....

বনহুর দু'হাতে নিজের দু'কান চেপে ধরে বলে—এই নাও ধরলাম। মুক্তি দাও।

আগে বলো, আর বলবো না।

আচ্ছা বললাম, বলবো না। আর বলবো না।

এবার নূরী বনহুরের গলা থেকে ওড়নাখানা খুলে নেয়। তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে বলে—দেখলে তো, অসম্ভবকে আমি সম্ভব করেছি কি না? দস্যুসম্রাটকে কান ধরে নাকানিচুবানি খাইয়ে ছাড়লাম। দশ জোয়ান পারতো একাজ করতে?

বনহুর মুখোভাব কান্নার মত করে বললো—নাছোরবান্দা, মাফ করো?

যাও করলাম। কিন্তু বলতে হবে কেন তুমি গোরী রাজ্যে গোলা বারুদ নিয়ে তৈরি হয়ে যাচ্ছো।

যদি বলি যুদ্ধ করতে।

যেতে দেবো না তোমাকে। প্রাণ গেলেও না। মাথা ঠুকে মরবো আমি।

আর যদি বলি শিকার করতে?

শিকারে গুলী লাগলেও, বারুদ লাগে না, তা আমি জানি।

আর যদি বলি অশরীরী আত্মা হত্যায়.....

আজগুবি কথা আমি বিশ্বাস করি না। তোমাকে বলতে হবে কেন যাবে গোরীতে?

তাহলে না শুনে ছাড়বে না দেখছি?

না।

বনহুর আর নূরী খাটের পাশে এসে বসলো।

নূরী তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর গোরী থেকে কায়েসের পাঠানো সংবাদটা জানালো নূরীর কাছে। পোড়োবাড়ির নির্জন ছাদে গভীর রাতে শুভ্র নারী মূর্তির করুণ কান্না গোরীবাসীদের মনে জাগিয়েছে এক বিস্ময়।

তাতে তোমার কি?

এমন একটা বিস্ময়কর ব্যাপার জানার বাসনা দমন করা যায় না বলে?

তা তো বুঝলাম কিন্তু.....

বলো থামলে কেন?

গুলী বারুদ প্রচুর পরিমাণ নেবে কেন?

দস্যু বনহুর কবে কোথায় এসব ছাড়া গিয়েছে বলো?

আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

সন্দেহের কোনো কারণ নেই, গিয়েই যখন যা ঘটে তোমাকে জানাবো।

সত্যি বলছো তো?

হাঁ নূরী।

কবে যাবে তাহলে?

কবে গেলে তুমি খুশি হও বলো?

কাল যেও।

বেশ, তাই হবে। রহমানকে জানিয়ে দিচ্ছি কথাটা!

নূরীর মুখমণ্ডল খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো।

কলিং বেলে চাপ দিতেই একজন অনুচর কক্ষে প্রবেশ করলো, বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—সর্দার!

বনহুর বললো—রহমানকে বলে দাও গোরী যাত্রা একদিন পিছিয়ে দিতে।

আচ্ছা সর্দার।

অনুচরটি পিছু হটে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে বললো—সত্যি তুমি কত ভাল!

❑

জমাট অন্ধকার রাত্রি।

গোরী রাজ্যের শেষ প্রান্তে তেরান নদীর ধারে পোড়োবাড়ির নিকট একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে লক্ষ্য করছে পোড়োবাড়িটার দিকে দস্যু বনহুর আর রহমান। উভয়ের হস্তেই পাওয়ারফুল রাইফেল।

তাজ আর দুলকী অদূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রভুদের মনোভাব তারাও যেন বুঝতে পেরেছে, তাই ওরা কান সতর্ক করে কিছুর প্রতীক্ষা করছে।

বনহুর আর রহমানের দেহে জমকালো ড্রেস, হাতে রাইফেল। জমাট অন্ধকারে বনহুর আর রহমানকে নজরেই পড়ছে না। স্তব্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে আছে ওরা পোড়োবাড়িটার দিকে।

যে জায়গায় বনহুর আর রহমান লুকিয়ে পোড়োবাড়িটাকে লক্ষ্য করছে, সে জায়গাটা গভীর জঙ্গলে ঢাকা একটা উঁচু স্থান। কতগুলো শাল আর দেবদারু গাছের ঝাড় জায়গাটাকে আরও ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানির শব্দ।

নিঝুম রাত।

দেবদারু গাছের শাখায় বাদুড়ের কিচ্ মিচ্ আওয়াজ আর সাঁ সাঁ বাতাস মিলে এক অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে বেওয়ারিশ কুকুরের তীব্র কণ্ঠস্বর।

রহমান আর বনহুর ওৎ পেতে বসে আছে একটা উঁচু টিবির পাশে, তাদের দু'পাশে ঘন আগাছা আর ঝোপঝাড়। শীতের হাওয়ায় কান দুটো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে যেন ওদের।

বনহুর গালপাট্টায় কান দুটো ভাল করে ঢেকে নিলো।

এমন সময় হঠাৎ একটা করুণ সুর ভেসে এলো তাদের কানে। সজাগভাবে কান পাতলো বনহুর আর রহমান।

রহমান বললো—সর্দার, কান্নার করুণ সুর.....

বনহুর পোড়োবাড়িটার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে ছিলো, বললো—কান্নার সুর নয় রহমান, এটা গানের সুর বলে মনে হচ্ছে। কোন মেয়ে মনের দুঃখে বা ব্যথায় এ রকম করুণ সুরে গান গেয়ে মনকে হাল্কা করতে চেষ্টা করে।

সর্দার ঐ দেখুন, ঐ দেখুন পোড়োবাড়ির ছাদের দক্ষিণ ধারে সাদা ধবধবে ছায়ামূর্তির মত.....রহমান রাইফেল উঁচু করে ধরলো পোড়োবাড়ির ছাদ লক্ষ্য করে।

বনহুর রহমানের উদ্যত রাইফেল নত করে দিলো, বললো—গুলি ছুঁড়ো না রহমান।

সর্দার, ঐ তো ছায়ামূর্তি!

চুপ করো!

বনহুর নিজের রাইফেল নত করে নিয়েছিলো! রহমানও বাধ্য হলো রাইফেলের মুখ নামিয়ে নিতে। সে অবাক হয়ে গেলো সর্দারের এ অদ্ভুত আচরণে। কেন সে ছায়ামূর্তি দেখেও গুলী ছুঁড়ছে না।

বনহুর কান পেতে মনোযোগ সহকারে শুনে চলেছে। পোড়োবাড়িটার ছাদের উপর থেকে এখন স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে সেই করুণ গানের সুর। এতোদিন লোকে যে সুরকে কান্নার সুর বলে ধারণ করেছে আজ বনহুর তা গানের সুর বলে আবিষ্কার করলো। তবে গানের সুর হলেও যে তা কান্নার সুরের মতই ব্যথাকরুণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রহমান বললো—সর্দার, এটাই রাণী দুর্গেশ্বরীর অশরীরী আত্মা।

চাপাকণ্ঠে হাসলো বনহুর—অশরীরী আত্মা তুমিও বিশ্বাস করো?

তবে ঐ ছায়ামূর্তিটা কি?

সেটাই আমি জানতে চাই রহমান।

তাহলে গুলী ছুঁড়ুন সর্দার।

যদি অশরীরী আত্মা না হয় তাহলে কি হবে জানো?

মরবে সর্দার।

একটা প্রাণ অহেতুক নষ্ট করে লাভ কি। আমি ঐ ছায়ামূর্তিটাকে জ্যান্ত পাকড়াও করতে চাই।

সর্দার! সর্দার সে কাজ কত ভয়ঙ্কর হবে।

রহমান, এ কথা তোমার মুখে সাজেনা। দস্যু বনহুরের কাছে ভয়ঙ্কর বলে কি আছে! আমি ঐ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবো রহমান।

সর্দার, ও বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে কেউ জীবিত ফিরে আসেনি কোনোদিন।

সে জন্যই তো আমার এতো সখ ও বাড়িতে প্রবেশ করার।

সর্দার!

রহমান, তুমি আমাকে বাধা দিও না।

এতোক্ষণ বনহুর আর রহমান একটা উঁচু টিলার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কথা বলছিলো, উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

রহমানও উঠে দাঁড়ালো।

পোড়োবাড়ির ছাদে শুভ্র ছায়ামূর্তি তখন অন্তর্হিত হয়েছে।

বনহুর বললো—রহমান, তুমি তাজ আর দুলকীকে নিয়ে অপেক্ষা করো, আমি পোড়োবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে শুভ্র বসনা ছায়ামূর্তিকে পাকড়াও করবো।

রহমান বলে উঠে—আমিও যাবো সর্দার আপনার সঙ্গে।

তা হয় না রহমান।

একা আপনাকে ছেড়ে দেবো না সর্দার। এই গভীর নিস্তব্ধ রাতে কিছুতেই এ সম্ভব নয়।

রহমান, তোমাকে সঙ্গে নেয়া নিত্যন্ত প্রয়োজন কিন্তু কেন নিচ্ছি না জানো? হঠাৎ যদি আমার কোনো বিপদ ঘটে, তুমি নিরাপদ থাকলে আমি ভরসাচ্যুত হবো না।

আজ না হয় থাক, কাল দিনের আলোতে একবার বাড়িখানা দেখে নিয়ে.....

শুভ্র ছায়ামূর্তির সন্ধানে যেতে হলে আজই আমাকে যেতে হবে রহমান। হয় তো এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে। অপেক্ষা করো, আমি অল্পক্ষণ পরেই ফিরে আসছি। বনহুর পোড়োবাড়িটার দিকে অগ্রসর হলো।

রহমান পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কে জানে তার সর্দার আর ফিরে আসবে কিনা!

উদ্যত রাইফেল হস্তে পোড়োবাড়িটার অদূরে এসে দাঁড়ালো বনহুর। অন্ধকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা সর্বগ্রাসী রাক্ষসীর মত।

বনহুর বাড়িটার সিংহদ্বার পার হয়ে এগুলো।

একদিন হয়তো এই সিংহদ্বারে পাহারা থাকতো বন্দুকধারী পাহারাদারগণ, আজ সেখানে আগাছা আর জঙ্গল ছাড়া কিছু নেই। সিংহদ্বার পার হয়ে এগুলো বনহুর, কেউ তাকে বাধা দিলো না।

বনহুর যতই এগুচ্ছে ততই বাড়িটাকে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। রাজপ্রাসাদের মত মস্তবড় বাড়ি। টানা বারান্দা ধরে বনহুর এগিয়ে যাচ্ছে সিঁড়ি-বারান্দার দিকে। কিন্তু উপরে উঠার সিঁড়িমুখ খুঁজে পাচ্ছে না। বনহুর পকেট থেকে বের করলো টর্চ, আলো ফেলে দেখতে লাগলো। হঠাৎ নজর পড়লো উঠানে ধবধবে সাদা উঁচু একটা সমাধি। বুঝতে পারলো বনহুর, এটাই রাণী দুর্গেশ্বরীর জীবন্ত সমাধিসৌধ। বনহুর ধীর পদক্ষেপে এগুলো এবার দুর্গেশ্বরীর সমাধিটির দিকে।

নিস্তব্ধ পোড়োবাড়ির মধ্যে বনহুরের ভারী বুটের শব্দ এক অদ্ভুত আওয়াজ তুলছিলো। সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে, ঝর ঝরে ইটের পাঁজরগুলো যেন অট্টহাসি হেসে উঠলো।

চমকে উঠলো বনহুর, সে অনুভব করলো, কেউ যেন আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো। কারো চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে সমীরণে। কেউ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বনহুর তাকাচ্ছে চারদিকে, একি তবে কোনো অশরীরী আত্মার দীর্ঘশ্বাস? কোনো মায়া না যাদু—কে কোথায় কাঁদছে! বনহুর অনেক চেষ্টা করেও কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না।

বনহুর টর্চের আলো ফেলে সমাধি সৌধের চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। সমাধির মধ্যে কেমন একটা শব্দ হচ্ছে বলে মনে হলো তার। বনহুর স্পষ্ট শুনতে পেলো তার পিছনে অন্ধকারে কেউ যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর মহূর্ত বিলম্ব না করে ফিরে তাকালো, অন্ধকারে স্পষ্ট নজরে পড়লো শুভ্রবসনা একটা নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উদ্যত করে গুলী ছুঁড়লো শুভ্রমূর্তি লক্ষ্য করে।

নিস্তব্ধ রাত্রির জমাট অন্ধকার যেন খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো। পোড়োবাড়িটার জরাজীর্ণ ইট-পাথরগুলো যেন অট্টহাসি হেসে উঠলো সে শব্দের সঙ্গে। বিস্ময়ভরা নয়নে দেখলো বনহুর, যেখানে শুভ্র বসনা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলো সে জায়গাটা শূন্য ফাঁকা শুধু গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখছে না। হঠাৎ বনহুর অনুভব করলো, তার পায়ের নিচে মাটিটা যেন নড়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাচ্ছে সে তলার দিকে।

বনহুর কিছু বুঝতে পারলো না, তার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো। নিজেকে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলো কিন্তু সক্ষম হলো না, ঢলে পড়লো বনহুর।

❑

সংজ্ঞা ফিরে এলো বনহুরের; চোখ মেলে তাকিয়ে বিস্মিত হলো, সুন্দর সুসজ্জিত একটা কক্ষে দুগ্ধফেনিল শয্যায় শায়িত সে। বনহুর প্রথমে মনে করলো স্বপ্ন দেখছে—পরে বুঝতে পারলো, স্বপ্ন নয় সত্য তার চারপাশে নানারকম আসবাবপত্র থরে থরে সাজানো রয়েছে।

শয্যায় উঠে বসলো বনহুর কিন্তু মাথাটা তখনও কেমন টলছে, চোখেও ঝাপসা লাগছে সবকিছু। দু'হাতে ভাল করে চোখ রগড়ে তাকালো! যে কক্ষে বনহুর এখন শায়িত সে কক্ষখানা এ কালের নয়—সেকেলে। কক্ষের ছাদের সঙ্গে বেলোয়ারী ঝাড় ঝুলছে। দেয়ালে সেকেলে মিস্ত্রির নিপুণ হস্তের কারুকার্য। কক্ষের আসবাবগুলোও অনেক পুরানো সেকেলে। যে খাটে বনহুর বসে আছে সে খাটখানা অতি মূল্যবান, মেহগনি কাঠের তৈরি বলে মনে হচ্ছে। খাটের চারপাশে মখমলের ঝালর। খাটের বিছানা-বালিশ সব মখমলের তৈরি।

বনহুর তাকালো মেঝের দিকে চোখ যেন ঝলসে গেলো, শ্বেত পাথরের উপরে জমকালো ফুলতোলা ঠিক কার্পেট বিছানো মেঝের মত।

একপাশে একটি শ্বেত পাথরের তৈরি ত্রিপয়া, তার উপরে একটি প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে।

বনহুর অবাক হয়ে দেখছে সব, তার রাইফেলখানার সন্ধানে তাকালো চারপাশে। কিন্তু কোথায় তার রাইফেল। সংজ্ঞা হারানোর পর রাইফেলখানা তার হাতছাড়া হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে তাকে এখানে এমনভাবে শয্যায় শায়িত করে রেখেছে। নিশ্চয়ই সে শত্রু নয় মিত্র, কারণ তাকে যেভাবে যত্ন করে সুন্দর কক্ষে দুগ্ধফেনিল বিছানায় আশ্রয় দিয়েছে সে কখনই শত্রু নয়। বনহুর শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো। এগুতে লাগলো—সম্মুখে একটি দরজা উন্মুক্ত দেখে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো পাশের কক্ষে। বনহুর আরও অবাক হলো, এ কক্ষে শুধু খাদ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো রয়েছে। ক্ষুধা পেয়েছিলো বনহুরের, কারণ কতক্ষণ যে সংজ্ঞা হারিয়ে ছিলো সে তা জানে না। পেটের নাড়ি চিন্ চিন্ করছে তার।

একটা টেবিলে নানারকম ফলমূল সাজানো ছিলো, বনহুরের প্রিয় খাদ্য হলো ফল। এবার বনহুর বসে পড়লো টেবিলের পাশে একটি চেয়ারে, তারপর খেতে শুরু করলো গো গ্রাসে।

ফল খেতে খেতে বনহুর লক্ষ্য করছিলো এ কক্ষটা। পূর্বের কক্ষের চেয়ে আরও ছোট এটা। এ কক্ষে কোনো আসবাবপত্র নেই—শুধু দুটো সেকেলে মেহগনি টেবিল, টেবিলে নানারকম খাদ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো। তবে ফলমূলই বেশি। নানা জাতীয় ফল। বনহুর অনেকগুলো ফল খেয়ে ফেললো। এখন মাথাটা বেশ স্বচ্ছ মনে হচ্ছে। কক্ষের এক পাশে দেয়ালে দেওয়ারগিরি লণ্ঠন জ্বলছে।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর। সে বুঝতে পারলো, যতই ভাল থাক সে, এখন বন্দী ছাড়া কিছু নয়। এ দুটি কক্ষই তার সম্বল, একটি তার বিশ্রামের জন্য, আর একটি খাবার ঘর। বনহুর নিজ দেহের দিকে লক্ষ্য করলো এবার, তার

দেহে পূর্বের ড্রেস রয়েছে বটে কিন্তু কোমরে যে গুলীভরা বেল্ট ছিলো তাও নেই, মাথার পাগড়ী নেই, পায়ে বুট নেই। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি নিজের আংগুলে পড়লো, চমকে উঠলো বনহুর—অদ্ভুত অপূর্ব একটি আংটি তার বাম হস্তের আংগুলে শোভা পাচ্ছে। বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগলো বনহুর, তার আংগুলে কি করে এ আংটি এলো! অনেকক্ষণ আংটিটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। অতি মূল্যবান পাথর তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাথরটি হতে নীলাভ একটি রশ্মি ঠিকরে বের হয়ে আসছে।

বনহুর ইচ্ছা করেই আংটিটা খুলে ফেললো না, সে আংগুলেই পরে রইলো। ঘুরেফিরে পথের অন্বেষণ করে চললো, কিন্তু কোনো পথই সে খুঁজে পেলো না।

হতাশ হয়ে পড়লো বনহুর, দেয়ালে প্রতিটি জায়গা সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান চালিয়েও লাভ হলো না কিছু। কক্ষ দুটি পৃথিবীর বুকে হলেও গভীর মাটির নিচে, এটা বনহুর ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে। এখনও তার মনে আছে, পোড়োবাড়ির উঠানে রাণী দুর্গেশ্বরীর সমাধির পাশে গাঢ় জমাট অন্ধকারে এক শুভ্রবসনা নারীমূর্তি, সে গুলি করেছিলো ঐ ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করে, পরক্ষণেই দুলে উঠেছিলো তার পায়ের তলার মাটিটা। তারপর সে নিচের দিকে নেমে চলেছিলো, এটুকুই তার মনে আছে.....

বদ্ধকক্ষে পায়চারী করতে লাগলো বনহুর, কে তাকে এভাবে বন্দী করলো? এসব কি রাণী দুর্গেশ্বরীর অশরীরী আত্মার কারসাজি? আপন মনেই হাসলো বনহুর, সে কোনো দিন প্রেতআত্মা বা অশরীরী আত্মা বিশ্বাস করে না। কিন্তু যেভাবে সে গুলী ছুঁড়েছিলো শুভ্রবসনা যদি সত্যি মানব দেহ হতো তাহলে কিছুতেই জীবিত থাকা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। আশ্চর্য শুভ্রবসনা গুলী খেয়েও কাবু হয়নি, অকস্মাৎ হাওয়ায় মিশে গেলো যেন।

বনহুর যতই ভাবে ততই অবাক হয়ে যায়, কে তাকে এভাবে বন্দী করে ফেললো। দুর্গেশ্বরীর অশরীরী আত্মা যে নয় তা সুনিশ্চয়। কোনো রক্তে-মাংসে গড়া মানবের বুদ্ধি-কৌশলেই যে তাকে এখানে আনা হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই এবং যে তাকে বন্দী করেছে সে তার শত্রু নয়—কিন্তু কে

সে? বনহুর তাকায় তার বাম হাতের আংগুলে উজ্জ্বল হীরক আংটিটির দিকে।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চললো, বনহুর কখনও পায়চারী করছে কখনও বসছে, কখনও বা শয্যায় শুয়ে গড়িয়ে নিচ্ছে। এক সময় বনহুর পিপাসা বোধ করায় এগিয়ে গেলো পাশের কক্ষে। একপাশে ত্রিপয়ে একটি পানীয় পাত্র, পাশেই গেলাস রয়েছে।

বনহুর ত্রিপয়ের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, গেলাসটা তুলে নিলো হাতে তারপর পানির পাত্র থেকে পানি ঢেলে নিয়ে প্রাণভরে পান করলো। সুস্বাদু ঠাণ্ডা পানি পান করে তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো বনহুর।

একি! পানি পান করার পর চোখ দুটো যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে তার, আর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারছে না। পা দু'খানা যেন টলছে। কোন রকমে মাতালের মত এগিয়ে চললো বনহুর শয্যার দিকে কিন্তু শয্যা পর্যন্ত এগুনো সম্ভব হলো না, ঢলে পড়লো মেঝেতে।

রহমান হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে তার গোরী আস্তানায়। সর্দার পোড়োবাড়িটার দিকে চলে যাবার পর রহমান অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করেছিলো কখন ফিরে আসবে সে আবার। কিন্তু ফিরে আর এলো না, একসময় গুলীর শব্দ ভেসে এলো তার কানে। রহমান সে মুহূর্তে গিয়েছিলো পোড়োবাড়িটার দিকে, আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলো সে। ভেবেছিলো, নিশ্চয়ই তার সর্দার কোনো বিপদে পড়েছে।

রহমান পোড়োবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিলো, সতর্কভাবে অনুসন্ধান করেছিলো তার সর্দারের। কিন্তু কোনো কিছুই নজরে পড়েনি।

একসময় ভোর হয়ে এসেছিলো, রহমান বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে ফিরে এসেছিলো তাজ আর দুলকী সহ গোরী আস্তানায়। আবার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দলবল সহকারে গিয়ে সন্ধান চালিয়েছিলো পোড়োবাড়ির মধ্যে। অনেক খোঁজাখুঁজি চালিয়েও পায়নি তারা তাদের সর্দারকে।

রহমান একেবারে মুষড়ে পড়েছে, তার শক্ত মনটাও আজ একেবারে ভেঙে গেছে যেন। ছোট্ট বালকের মতই ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ওর।

কিন্তু কাঁদতে পারছিলো না, তাকে যদি কাঁদতে দেখে তার অনুচরগণ আরও নেতিয়ে পড়বে। রহমান মনের ব্যথা মনে চেপে প্রভুর অনুসন্ধান করে চলেছে।

পোড়োবাড়ির প্রতিটি জায়গায় তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলো রহমান তার অনুচরদের নিয়ে কিন্তু হতাশ হলো। শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হলো তাকে দলবল নিয়ে গোরী আস্তানায়।

রহমান দলবল নিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেও সে প্রতি গভীর রাতে সে স্থানটিতে এসে দাঁড়াতো যে স্থানটিতে সর্দার আর সে এসে দাঁড়িয়েছিলো সেদিন রাতে, যেদিন সর্দার শুভ্র বাসনা নারীমূর্তিটিকে লক্ষ্য করে প্রবেশ করেছিলো পোড়োবাড়ির মধ্যে কিন্তু আর ফিরে আসেনি।

প্রতিদিন প্রতীক্ষা করতো রহমান গুলীভরা রাইফেল নিয়ে। সে কান্নার সুর আর শোনা যায় না, সেই শুভ্রবসনা নারী মূর্তিও আর পরিলক্ষিত হয় না। রহমান রাইফেল উদ্যত করে প্রতীক্ষা করতো, কোনো ক্রমে একবার সেই নিশাচর শুভ্রবসনাকে দেখতে পেলে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না, সে গুলী ছুড়ে হত্যা করবে তাকে। সেদিন সর্দার বাধা না দিলে রহমান কোনো দ্বিধা করতো না গুলী সে ছুঁড়তোই।

রহমান নির্জনে বসে কাঁদে। সর্দার আর ফিরে আসবে সে আসা তার নেই। সমস্ত রাত জঙ্গলে টিলার পাশে বসে থাকে, একসময় ভোর হয়ে আসে, হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে উড়ে বসে দুলকীর পিঠে।

❑

বনহুরের জ্ঞান ফিরে আসে, উঠে বসে সে ধীরে ধীরে। স্মরণ করতে চেষ্টা করে এখন সে কোথায়? মনে পড়ে পানির পাত্র থেকে পানি ঢেলে পান করার পর হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠেছিলো, পা দু'খানা টলছিলো তার মাতালের মত, তারপর সে কিছুতেই নিজেকে শয্যা পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেনি, পড়ে গিয়েছিলো মেঝেতে---কিন্তু একি, সে শয্যায়

এলো কি করে? বনহুর অবাক হয়ে গেলো। মনোযোগ দিয়ে ভাবতে লাগলো সে। হঠাৎ দেহের দিকে নজর পড়লো—চমকে উঠলো বনহুর। তার দেহে অন্য ড্রেস। তার দস্যু ড্রেস অন্তর্হিত হয়েছে। এখন তার দেহে মূল্যবান ড্রেস শোভা পাচ্ছে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো বনহুর। তার দৃষ্টি এসে থামলো নিজের আংগুলের উজ্জ্বল নীলাভ হীরক আংটিটির দিকে। আনমনা হয়ে গেলো বনহুর ধীরে ধীরে, কিছুই সে ভেবে পাচ্ছে না যেন।

কতক্ষণ যে বনহুর সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় ছিলো জানে না। বেশ ক্ষুধা অনুভব করছে সে এখন। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, এগুলো পাশের কক্ষের দিকে। আজ নতুন ধরণের ফলমূল ও খাদ্যসম্ভারে ভরে আছে টেবিলখানা। বনহুর তৃপ্তি সহকারে ফলমূল ভক্ষণ করলো। পানির পাত্রের দিকে নজর করতেই বুঝতে পারলো, ওতে রয়েছে অমৃত নামে শারাব। তবু বনহুর উঠে দাঁড়ালো এগিয়ে গেলো পানি পাত্রের দিকে গেলাস পূর্ণ করে পানি ঢেলে নিয়ে তুলে ধরলো মুখের কাছে। কিন্তু পান করলো না সে, আবার পানি ঢেলে রাখলো পাত্রমধ্যে।

ফিরে এলো শয্যার পাশের পিছনে হাত রেখে পায়চারী করলো কিছুক্ষণ। একপাশে দেয়ালে একখানা বড় আয়না বসানো ছিলো। সেকেলে আয়না। বনহুর দৃষ্টি তুলে ধরতেই তার প্রতিবিম্ব দেখতে পেলো সম্মুখ আয়নাখানায়। নিজেকে নতুন ড্রেসে অন্যরকম দেখাচ্ছিলো—অবশ্য মন্দ নয় সুন্দর লাগছিলো তাকে। তার দেহের মূল্যবান পোশাকটা হাল্কা সোনালী রং-এর ছিলো। বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো তার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না সে আয়নাখানা থেকে। ড্রেসটা অপূর্ব মানিয়েছে দেহে।

নিজের অজান্তে বনহুর এগিয়ে গেলো আয়নার পাশে। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি এসে পড়লো আয়নাখানার এক কোণে। ছোট একটা বোতামের মত কিছু চক্‌চক্ করছে। বনহুর বোতামে চাপ দিলো আংগুল দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটে গেলো, আয়নাখানা সরে বেরিয়ে পড়লো একটা সুড়ঙ্গমুখ। আনন্দে বনহুরের মনটা দুলে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই একটু দমে

গেলো, এ মুহূর্তে তার নিকটে কোন অস্ত্র নেই বলে। না জানি ঐ সুড়ঙ্গমধ্যে কি অপেক্ষা করছে।

বনহুর ভীত হবার জন নয়, সে ঐ সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো বিনা দ্বিধায়। এগুতে লাগলো সুড়ঙ্গমধ্যে, যতই এগুচ্ছে ততই যেন কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে তার। অনেক দূরে এসে পড়লো সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে কেউ তাকে বাধা দিলো না বা কোনো বিপদ এলো না তার জন্য। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বনহুর দেখলো সে একটি কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময় ভরা নজরে চারদিকে তাকালো, এবার শুধু হতবাকই হলোনা স্তম্ভিত হলো। কারণ কক্ষটা কোনো চিত্র শিল্পীর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কক্ষ মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছড়ানো আছে শিল্পী হস্তের অসংখ্য ছবি। কতগুলো ক্যানভাসে আঁকা নিখুত প্রাকৃতিক দৃশ্য, কতগুলো জীব জন্তুর ছবি। শুধু ক্যানভাসে আঁকা ছবিই নয় পাথরে খোদাই করা মূর্তি আছে কতগুলো। বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো দু'চোখে তার রাজ্যের বিস্ময়।

কে সে শিল্পী যার আঁকা ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছে বাস্তব জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। মাঝখানে একটি টেবিলে মোমদানীতে মোমবাতি জ্বলছে। পাশেই নানা রকমের রং এর বাট আর তুলি পড়ে রয়েছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে প্রত্যেকটা ছবি দেখতে লাগলো। সত্যি অপূর্ব অদ্ভুত ছবি, বনহুর এমন ছবি দেখেনি কোনোদিন। এক এক করে প্রত্যেকটা ছবি সে দেখছে, শিল্পী হস্তের বৈচিত্র্যময় সংমিশ্রণ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো বনহুর। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো ওদিকে ত্রিপয়ার উপরে কোন একটা ছবির দিকে। যদিও মূল্যবান চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে ছবিটা তবু বেশ বোঝা যাচ্ছে সেটাও শিল্পীর হস্তে তৈরি কোন অসমাপ্ত সৃষ্টি। ত্রিপয়ার পাদমূলে ছোট্ট একটা আসনে কতগুলো রং পাত্র থরে থরে সাজানো রয়েছে। আর রয়েছে ছোট বড় কতকগুলো তুলি।

একটা বড় মোমবাতি জ্বলে জ্বলে প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে এসেছে। বনহুর এ অর্দ্ধ সমাপ্ত ছবিখানার পাশে এসে দাঁড়ালো, চাদরখানা সরিয়ে ফেললো সে

দ্রুত হস্তে। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পিছিয়ে এলো কয়েক পা, চাদরখানা তার হাতের মুঠায় ঝুলছে। চোখে-মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তে।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে, একি—এ যে তারই নিখুঁত ছবি। স্বপনকুমারের বেশে তারই চেহারা। হুবহু তারই চোখমুখ চিবুক এমন কি চুলগুলোও। ছবিখানার দিক থেকে সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না বনহুর। অপূর্ব অদ্ভুত ছবি খানা, যেন প্রাণবন্ত হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। রক্তে-মাংসে গড়া সজীব একটি দেহ যেন।

বনহুর কতক্ষণ তাকিয়ে আছে, বিস্ময় ঝরে পড়ছে তার দু'চোখে। ললাটে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কে এ শিল্পী যার তুলির ছোঁয়ায় দস্যু বনহুর আবদ্ধ হয়েছে ক্যানভাসের বুকে। ছবিখানা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, শুধু তার দক্ষিণ বাহুর কিছুটা অংশ এখনও বাকি রয়েছে মাত্র।

বনহুর নিজের ছবিখানাকে নির্বাক দৃষ্টি মেলে দেখলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে, যতই দেখছে ততই যেন আরও দেখতে ইচ্ছা করছে ওর। গভীর নীল দুটো চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, প্রশস্ত ললাট, কুঞ্চিত কেশরাশি, চিবুকের নিচে একটু সুন্দর ভাঁজ, রক্তাক্ত গণ্ড। পুরু ওষ্ঠদ্বয়, বলিষ্ঠ মাংসপেশী যুক্ত পৌরুষ দীপ্ত দেহ। অজানা শিল্পীর আঁকা ছবির মধ্যে বনহুর আজ নতুন করে আবিষ্কার করলো নিজের আসল রূপ। এগিয়ে এলো সে ছবিখানার পাশে, হস্তস্থিত চাদরখানা দিয়ে ত্রিপয়ার উপরে ক্যানভাসে আঁকা তার প্রতিচ্ছবিটাকে ঢেকে দিলো পূর্বের মত করে।

বনহুর আর সেখানে বিলম্ব করলো না, সে সুড়ঙ্গপথে ফিরে এলো আবার সেই কক্ষে। আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাশের বোতামে চাপ দিতেই আবার সেটা স্বস্থানে এসে আগের মত আকার ধারণ করলো।

শয্যায় এসে বসলো বনহুর। আজকের মত বিস্ময় তার মনে কোনোদিন জেগেছে কিনা সন্দেহ। বনহুর তাকালো তার বাম হস্তের আংটিটার দিকে, এ আংটিটার সঙ্গে গভীর সম্বন্ধ রয়েছে ঐ ক্যানভাসে আঁকা তার ছবিখানার সঙ্গে। এ আংটিটা যে তার হাতের আংগুলে পরিয়ে দিয়েছে সেই যে ঐ ছবিখানার শিল্পী তা স্পষ্ট বুঝতে পারলো বনহুর।

শয্যায় শুয়ে অনেক করে ভাবলো বনহুর, কত কথাই তার মনের আকাশে উদয় হলো, আবার মুছে গেলো আলগোছে। না জানি রহমান ও তার গোরী আস্তানার অনুচরগণ কতই না ভাবছে তার জন্য। কত না খোঁজাখুঁজি করছে, হয়তো বা কান্দাই আস্তানায়ও এ সংবাদ পৌঁছে গেছে। বনহুর এখান থেকে বের হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো প্রথম দিন। আজ কিন্তু তার তেমন আগ্রহ নেই কারণ তার জানার বাসনা আজ তাকে ক্ষান্ত করেছে প্রবল ইচ্ছা থেকে। বনহুর এ রহস্যের উদ্ঘাটন করতে চায়। কে এই শুভ্রবসনা নিশাচর, যে কান্নার সুরে গুণগুণ করে গান গায়? কে তার হাতের আংগুলে আংটি পরিয়ে দিয়েছে? কে তার প্রতিবিম্ব এঁকেছে ক্যানভাসের বুকে?

অনেকক্ষণ ভাবলো বনহুর কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না। একসময় উঠে দাঁড়ালো, আয়নায় তার নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসলো সে। কেনো হাসলো, সে ছাড়া কেউ জানে না। ফিরে গেলো বনহুর পাশের ঘরে, যে কক্ষে নানাবিধ ফলমূল থরে থরে সাজানো আছে। বনহুর সোজা পানির পাত্রের দিকে এগিয়ে গেলো, গেলাস পূর্ণ করে পানি ঢেলে নিয়ে তুলে ধরলো মুখের কাছে। কিন্তু আসলে সে পানিয় পান করলো না, আলগোছে ঢেলে দিলো জামার আস্তিনের মধ্যে।

বনহুর পা বাড়ালো পাশের কক্ষে শয্যার দিকে, পা দু'খানা তার টলছে মাতালের মত—। কোনোক্রমে শয্যা পর্যন্ত এগুলো বনহুর তারপর ধপ্ করে শয্যার উপর পড়ে গেলো উবু হয়ে।

আসলে বনহুর পানি পান করেনি, সে পানি পান করার অভিনয় করে চললো। দু'চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ পড়ে রইলো, দেখতে চায় কি ঘটে।

কিছুক্ষণ অসাড়ের মত পরে রইলো বনহুর, কোনো সাড়া শব্দ নেই। ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠছে যেন সে, এমন নিশ্চুপ কতক্ষণ থাকা যায়, বিশেষ করে সজ্ঞানে।

হঠাৎ বনহুরের কানে একটা পদশব্দ ভেসে আসে, বনহুর বুঝতে পারে, তার কক্ষের দেয়ালের আয়নাখানা সরে গেল মর মর করে। বনহুর উবু হয়ে

থাকায় কিছু দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু অনুভব করছে—কেউ যেন প্রবেশ করলো তার কক্ষে। স্পষ্ট মনুষ্য পদশব্দ কর্ণগোচর হচ্ছে তার। কেউ যেন ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে তার শয্যার দিকে।

নিশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করছে বনহুর, কে সে যে তার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো। বনহুরের বুকটা টিপ্ টিপ্ করছে, যদিও প্রবল একটা জানার বাসনা তাকে চঞ্চল করে তুলেছে, তবুও অসাড়ের মত চুপচাপ পড়ে রইলো।

পিঠে হাত পড়লো, কে যেন বসেছে তার খাটের পাশে। তার নিশ্বাসের শব্দ কানে প্রবেশ করছে। বনহুর অনুভব করলো কোমল একখানা হাতের স্পর্শ তার পিঠে চুলে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে।

এবার হস্ত সঞ্চারিত ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এগিয়ে গেলো কক্ষের একদিকে।

বনহুর আলগোছে মাথা তুলে তাকালো, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো, এ যে সেই শুভ্রবসনা নারীমূর্তি। পিছন থেকে বনহুর শুভ্রবসনার মুখ দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু সে বুঝতে পারলো, এই শুভ্রবসনাই গভীর রাতে পোড়োবাড়ির ছাদে নিশাচরীর মত ঘুরে বেড়াতো, আর করুণ সুরে গান গাইতো।

এবার বনহুর শুনতে পেলো শুভ্রবসনা করতালি দিয়ে কিছু সংকেতধ্বনি করলো। যেমন পড়ে ছিলো তেমনি নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলো বনহুর।

বনহুর একটা সাঁ সাঁ শব্দ শুনতে পেলো। মনে হলো তার কক্ষের ছাদ থেকে কিছু নেমে আসছে নিচের দিকে। অতি কষ্টে বনহুর নিজেকে শক্ত করে রাখলো, দেখবার ইচ্ছাকে দমন করে ফেললো সংযতভাবে।

শুভ্রবসনা কারো সঙ্গে কথা বলছে, অতি হাল্কা চাপা স্বরে এবার বনহুর স্পষ্ট বুঝতে পারলো। এবার দুটি লোকের অস্তিত্ব অনুভব করলো বনহুর। শুভ্রবসনার ইংগিতে লোক দুটি বনহুরকে ভালভাবে সোজা করে বিছানায় শুইয়ে দিলো। একটি চাদর চাপা দিলো ওরা তার দেহে।

শুভ্রবসনা পুনরায় করতালি দিলো, এবার বনহুর শুনতে পেলো আবার সেই সাঁ সাঁ শব্দ। কৌতূহল দমন করতে পারলো না বনহুর, আলগোছে

দেখে নিলো। লোক দুটি লিফটের মত একটা জিনিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর সেটা অতি দ্রুত উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। বনহুর বুঝতে পারলো, এ লিফটেই তাকে বন্দী করে এখানে আনা হয়েছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ বনহুর এসব নিয়ে ভাবতে পারলো না। শুভ্রবসনা তার শয্যার পাশে এসে বসেছে, বনহুর চেষ্টা করলো তার মুখমণ্ডল দেখার জন্য কিন্তু আশ্চর্য শুভ্রবসনার মুখ ঢাকা রয়েছে আর একটি শুভ্র আবরণে। অস্পষ্ট একটি মুখ পরিলক্ষিত হলো বটে কিন্তু চিনবার কোনো উপায় ছিলো না।

শুভ্রবসনা বনহুরের দেহের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে।

ওর নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট কানে আসছে তার।

বনহুরের মনে তখন প্রবল একটা জানার বাসনা তোলপাড় করছে। এ শুভ্রবসনাই তার আঙ্গুলে আংটিটি পরিয়ে দিয়েছে, এ শুভ্রবসনাই যে তার প্রতিচ্ছবি এঁকে তাকে আটক করেছে শুভ্র ক্যানভাসের বুকে তা বেশ বুঝতে পারছে বনহুর। কে এই শুভ্রবসনা? রাণী দুর্গেশ্বরীর অশরীরী আত্মা হলে সে এমন করে সজীব হয়ে উঠতে পারতো না। তবে কে এই শুভ্রবসনা?

বনহুর মৃতের ন্যায় পড়ে রইলে নিস্পন্দ হয়ে।

দেখতে চায় সে কে এই শুভ্রবসনা আর কিইবা করে সে।

শুভ্রবসনা বনহুরের বাম হাতখানা তুলে নিলো হাতের উপরে, এ হাতের আঙ্গুলেই রয়েছে সেই অপূর্ব হীরক আংটিটি। শুভ্রবসনা হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের গণ্ডে স্পর্শ করলো, গণ্ডেই শুধু নয় চিবুকে ঠোঁটে আবেগভরে ঘষতে লাগলো বারবার।

বনহুর নীরবে অনুভব করছে, সে চুপচাপ শুয়ে রইলো। শুভ্রবসনার কার্যকলাপ লক্ষ্য করাই হলো তার উদ্দেশ্য।

শুভ্রবসনা এবার এগিয়ে গেলো বনহুরের পায়ের দিকে।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে রইলো।

শুভ্রবসনা বনহুরের পা দু'খানার উপর উবু হয়ে মাথা রাখলো, কোমল একখানা চিবুকের স্পর্শ অনুভব করলো বনহুর নিজের পায়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে শুভ্রবসনা, বনহুরের পা দু'খানা সিক্ত লাগছে। বনহুরের বিস্ময়ের

সীমা নেই। একি ব্যাপার, সে যাকে কোনোদিন দেখেনি, চেনে না, জানেনা, সে তাকে এমন গভীরভাবে ভালবাসে। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে বনহুর।

উঠে দাঁড়ালো এবার শুভ্রবসনা, তারপর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সে বনহুরের মুখের দিকে। এখনও বনহুর নিশ্চুপ, শেষ অবধি দেখবে সে, কোথায় যায় এই শুভ্রবসনা।

বনহুর লক্ষ্য করলো শুভ্রবসনা আয়নাখানার নিকটে গিয়ে দাঁড়ালো পাশের বোতামে চাপ দিলো সে আঙ্গুল দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে বেরিয়ে এলো একটি সুড়ঙ্গমুখ। শুভ্রবসনা সেই সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো। তারপর পুনরায় আয়নাখানা স্বস্থানে পূর্বের ন্যায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কেউ এখন বুঝতে পারবে না এখানে কোনো সুড়ঙ্গমুখ আছে।

শুভ্রবসনা অন্তর্ধান হতেই বনহুর শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো, চোখেমুখে তার জানার উন্মাদনা। শুভ্রবসনা নারী মূর্তি যে একটা বাস্তব রক্তেমাংসে গড়া মানবী তাতে কোনো সন্দেহ নেই তখন তার মনে। বনহুর পায়চারী করতে লাগলো আর গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে লাগলো। এখনও তার দেহে সেই মূল্যবান ড্রেস শোভা পাচ্ছে। হাতের আঙ্গুলে আংটি। বনহুর মাঝে মাঝে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখে নিচ্ছে, ভ্রু দুটি কুঁচকে যাচ্ছে তার দিক যেন সে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে।

শুভ্রবসনা তার কক্ষ হতে চলে যাবার পর বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, বনহুর এবার আয়নাখানার পাশের বোতামে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে আয়নাটি সরে সেখানে বেরিয়ে এলো একটি সুড়ঙ্গমুখ।

বনহুর সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করলো, অতি লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে চললো ধীরে ধীরে। সুড়ঙ্গপথে যতই এগুচ্ছে ততই একটা সুগন্ধ তাকে মোহিত করে তুলছে যেন। বনহুর বুঝতে পারলো এ গন্ধ ধূপের ছাড়া কিছুর নয়।

সুড়ঙ্গপথ প্রায় শেষ হয়ে এলো, এবার সেই কক্ষ যে কক্ষের মধ্যে রয়েছে অজানা শিল্পীর অপূর্ব সৃষ্টি তার অদ্ভুত প্রতিচ্ছবিখানা।

বনহুর অতি সন্তর্পণে পা রাখলো সেই কক্ষের দরজায়। এখন ধূপের গন্ধের সঙ্গে একটি সুন্দর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে।

বনহুর সম্মুখে চাইতেই বিস্মিত হলো, তার ছবিখানার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে আছে সেই শুভ্রবসনা নারী মূর্তি। ভাগ্যিস দরজাটার দিকে পিছন ফিরে বসেছিলো শুভ্রবসনা তাই সে বনহুরকে দেখতে পেলো না বা তার আগমন বুঝতে পারলো না।

বনহুর আড়ালে আত্মগোপন করে অবাক হয়ে দেখছে। শুভ্রবসনা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তার ছবিখানার দিকে। সম্মুখস্থ ধূপদানী থেকে সুগন্ধি ধূম্ররাশি বেরিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে তার ছবিখানাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

পাশেই মোমদানীতে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে।

মোমের আলো আর ধূপের ধূম্ররাশির মধ্যে শুভ্রবসনা তার ছবিখানাকে পূজা করছে বলেই মনে হলো বনহুরের।

আরও আশ্চর্য হলো বনহুর, তার ছবিখানা যেন এখন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, শুভ্রবসনার দিকে তাকিয়ে হাসছে যেন সে। তবে কি শুভ্রবসনার সঙ্গে তার ছবিখানার গভীর কোন সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। হয়তো তাই হবে, না হলে ছবি কোনো দিন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এমন করে।

বনহুর মোহগ্রস্তের মত স্থির নয়নে তাকিয়ে দেখছে। ধীরে ধীরে সে [illegible] কোন্ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

❑

রহমান দলবল নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েও সর্দারের কোনো হদিস পেলো না। দারুণ উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ নিয়ে একদিন ফিরে এলো রহমান কান্দাই আস্তানায়।

ছুটে এলো নূরী বনহুরের সন্ধানে, রহমানকে একা দেখে বিমর্ষ হলো তার মুখমণ্ডল। প্রশ্ন করলো সে চঞ্চল কণ্ঠে—রহমান, আমার হুর কোথায়? আমার হুরকে তো দেখছি না?

রহমান দুলকীর লাগাম ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, মুখমণ্ডল কালো মলিন হয়ে উঠেছে। নূরীর কথায় সে সহসা কোনো জবাব দিতে পারলো না। মাথাটা নিচু করে নিলো সে।

নূরী আর নাসরিন একাই সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলো অশ্বপদ শব্দ শুনতে পেয়ে। নূরী রহমানের জামার আস্তিন চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—কথা বলছো না কেন? আমার হুর কোথায়---

নাসরিনও যেন বিমর্ষ মলিন হয়ে পড়েছে। সেও উদ্বিগ্ন হয়ে স্বামীকে প্রশ্ন করে বসলো—সর্দার কোথায়?

এবার রহমান কথা না বলে পারলো না, বললো সে—সর্দার কোথায় আমি জানি না।

নূরী রহমানের জামার আস্তিন ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—তোমার সঙ্গে সে গেছে, তুমি জানো না বলছো?

হাঁ, আমি জানি না নূরী। সত্যি আমি জানি না।

আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। বলো আমার হুর কোথায়?

সব যদি জানতে চাও তবে এসো আমার সঙ্গে, সব তোমাকে খুলে বলবো। রহমান দুলকীর লাগাম তার এক অনুচরের হাতে দিয়ে এগিয়ে চললো আস্তানার মধ্যে।

একটা নির্জন স্থানে এসে বসলো রহমান।

নূরী আর নাসরিন বসলো তার পাশে।

ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে ওরা তাকালো রহমানের মুখের দিকে, রহমান সর্দারের সমস্ত ঘটনাটা বলে গেলো এক এক করে।

সব শুনে নূরী দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো আকুলভাবে।

রহমান আর নাসরিনের চক্ষুও শুষ্ক ছিলো না। নাসরিনও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

রহমান নূরীর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো কিন্তু কি বলে সান্ত্বনা দেবে সে।

নূরী কেঁদে কেঁদে বললো— ওকে তুমি একা যেতে দিলে কেনো? বলো কেনো যেতে দিলে---

রহমান বললো—আমি সর্দারকে অনেক করে বারণ করেছিলাম। সর্দার, আপনি ঐ পোড়োবাড়ির মধ্যে যাবেন না, যাবেন না। তবু সর্দার আমার বারণ শুনলেন না। আমি তার সঙ্গে যেতে চাইলাম তাও যেতে দিলেন না--বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো রহমানের গলা।

নূরী বলে বসলো—আমি যাবো সেখানে। সেই পোড়োবাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবো। খুঁজে দেখবো কোথায় আছে আমার হুর।

মনে মনে শিউরে উঠলো রহমান, ঐ পোড়োবাড়িটার কথা স্মরণ হতেই একটা অজানা আশঙ্কা দোলা দিলো তার হৃদয়ে। নূরীর কথায় কোনো জবাব দিতে পারলো না রহমান।

নূরী ব্যাগ্র কণ্ঠে বলে উঠলো—অমন চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও? জবাব দাও রহমান ভাই?

শেষ অবধি নূরীকে আটকে রাখতে পারলা না কেউ। গোরী অভিমুখে রওয়ানা দিলো রহমান, নূরী আর নাসরিন।

এদিকে রহমান যখন নূরী আর নাসরিন সহ সর্দারের খোঁজে পোড়োবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো তখন বনহুর শুভ্রবসনা নারীমূর্তিটির অদূরে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রতীক্ষা করছে।

শুভ্রবসনা বনহুরের ছবিখানাকে পুষ্প অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে চলেছে, শুধু আশ্চর্য নয়, বিস্ময়কর ব্যাপার যেন। সমস্ত কক্ষটি ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো ধীরে ধীরে। শুভ্রবসনাকে এক মায়াময়ী অপ্সরী বলে মনে হতে লাগলো।

ক্রমেই যেন বনহুর ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়েছে।

কে এই শুভ্রবসনা যে তাকেই শুধু ভালবাসেনি তার ছবি খানাকেও সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে গ্রহণ করেছে।

বনহুর শুভ্রবসনার দিকে এগুবে ঠিক সেই মুহূর্তে শুভ্রবসনা কোথায় যেন তলিয়ে গেলো কোনো অতলে। বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে দেখলো কক্ষমধ্যে অগণিত ছবির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার ছবিখানা, ছবির পাদমূলে পড়ে

আছে রং-এর বাটি আর তুলি। ধূপদানী থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধূম্ররাশি ঘুর পাক খেয়ে খেয়ে বেরিয়ে আসছে।

মোমের আলো জ্বলে জ্বলে এখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

বনহুর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সব যেন তার কাছে যাদুমন্ত্রের মতই বিস্ময়কর লাগছে। বনহুর ফিরে এলো তার শয়নকক্ষে।

বনহুর এসেছিলো পোড়োবাড়িটার রহস্য উদ্ঘাটন করতে, এখন যেন সে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে গভীর এক রহস্যজালে। এ জাল ছিন্ন করা তার পক্ষে কঠিন মনে হচ্ছে।

দস্যু বনহুর অদ্ভুত মায়াজালে আচ্ছন্ন।

অনেক চেষ্টা করেও বনহুর এই পোড়োবাড়ির বাইরে যেতে সক্ষম হচ্ছে না।

ক্রমেই যেন হাঁপিয়ে পড়ছে বনহুর।

কোনো দিন যে বন্ধ ঘরে বন্দী থাকার বান্দা নয়, আজ বনহুর একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বের হবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে সে।

গভীর রাত।

বনহুর ঘুমিয়ে পড়েছে তার নির্দিষ্ট শয্যায়।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে খেয়াল নেই।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো তার। একটা ক্ষীণ করুণ সুর ভেসে এলো বনহুরের কানে। উঠে বসলো শয্যায়, কোথা থেকে এ সুর আসছে শোনার চেষ্টা করলো সে মনোযোগ সহকারে।

কিন্তু এ সুর কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারলো না। বনহুর পাশের কক্ষে প্রবেশ করে অনেক সন্ধান করলো। সুরটা পূর্বে কোথাও শুনেছে বলে মনে হলো তার। বুঝতে পারলো বনহুর এই সুরই সে প্রথম দিন পোড়োবাড়ির ছাদে শুনতে পেয়েছিলো।

ক্রমেই সুরটা নিকটবর্তী হচ্ছে বলে মনে হলো, স্পষ্ট হতে স্পষ্ট হয়ে শোনা যাচ্ছে। বনহুর উৎগ্রীব হয়ে শুনতে লাগলো।

অতি সুন্দর মিষ্ট-মধুর কণ্ঠের করুণ সুর বনহুর যেন তন্ময় হয়ে শুনছে। ঠিক্ বোঝা যাচ্ছে না সুরটা কান্নার না গানের। হঠাৎ আওয়াজ হলো গুড়ুম---গুড়ুম---সঙ্গে সঙ্গে করুণ কণ্ঠের সুমিষ্ট সুর থেমে গেলো।

বনহুর বদ্ধ কক্ষে স্তব্ধ হয়ে শুনছে।

আবার চারদিক নিস্তব্ধ। দেয়াল গিরি আলোটাই মৃদু মৃদু আলো বিকিরণ করছে।

দেওয়াল গিরির আলোক ছটায় বনহুরের দেহের মূল্যবান পোশাকখানা ঝলমল করছে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায়, ওপাশেই আছে সুড়ঙ্গমুখ—যে সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হলেই রয়েছে তার অদ্ভুত প্রাণবন্ত ছবিখানা।

বনহুর যখন ভাবছে তখন হঠাৎ তার কানে এলো বেশ কতগুলো পদশব্দ, কারা যেন তার কক্ষের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বনহুর বদ্ধ কক্ষে বন্দী ব্যাঘ্রের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। বার বার তাকিয়ে দেখছে উপরের দিকে, যেখানে মিশে রয়েছে লিফটের মত বস্তুটা। হঠাৎ দেখলে বুঝবার জো নেই, ঠিক ছাদের কারুকার্য বলে মনে হয়।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে গভীরভাবে ভাবলো বনহুর। কোনোক্রমে ছাদের লিফ্‌টটা একবার নেমে এলে হয়তো সে দেখে নেবে তাকে এবার কে আটকায়। কিন্তু কিভাবে ওটাকে নামিয়ে আনা যায়। সমস্ত কক্ষটা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলো, কোথাও যদি কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

সহসা বনহুরের চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো। তার কক্ষের দেয়ালের এক জায়গায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র পথ দৃষ্টিগোচর হলো। ছিদ্রপথটা দেয়ালে কারুকার্যের মধ্যে মিশে আছে যেন একেবারে।

বনহুর সেই ছিদ্রপথে আংগুল প্রবেশ করিয়ে চাপ দিলো সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে সাঁ সাঁ করে নেমে এলো একটি লিফট। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে লিফটে চেপে দাঁড়ালো। লিফটের পাশেই ছিলো একটি সুইচ, বনহুর সুইচে চাপ দিলো, অমনি তাকে সহ লিফটখানা দ্রুত উঠে গেলো উপরে।

বনহুর দেখলো একটি কক্ষের মেঝেয় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে, হঠাৎ আবির্ভাবের মত। ফিরে তাকাতেই নজরেই পড়লো, কক্ষমধ্যে কয়েকজন লোক গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুরের দিকে নজর পড়তেই লোকগুলো বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়লো। কয়েকজন রিভলভার উদ্যত করে ছুটে এলো বনহুরের দিকে।

সম্মুখে তাকাতেই বনহুর দেখতে পেলো কক্ষের একপাশে তিনটি থামের সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থায় নূরী, রহমান আর নাসরিন।

বনহুরকে দেখামাত্র নূরী আনন্দধ্বনি করে উঠলো—হুর---

রহমানও অস্ফুট শব্দ করলো—সর্দার---

কিন্তু সেই মুহূর্তে বনহুরকে কয়েকজন বলিষ্ঠ পুরুষ উদ্যত রিভলভার এবং বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

বনহুর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র থাকায় চারদিক হতে তাকে ঘেরাও করে বন্দী করে ফেললো। লৌহশিকল দ্বারা মজবুত বেঁধে ফেলা হলো তাকে।

নূরী আর্তনাদ করে উঠলো— হুর--আমার হুর---

রহমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে, সে নিজেও বন্দী হয়েছে আজ একেবারে আশ্চর্যভাবে। বন্দী হবার পূর্ব মুহূর্তে সে জঙ্গলমধ্যে পোড়োবাড়ির অদূরে অপেক্ষা করছিলো নাসরিন আর নূরী ছিলো তার পাশে। তাদের দৃষ্টি ছিলো পোড়োবাড়ির ছাদের দিকে। রহমানের হাতে ছিলো গুলীভরা পাওয়ারফুল রাইফেল।

হঠাৎ তাদের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠেছিলো শুভ্রবসনা সেই নারীমূর্তি। আজ রহমান কোনো দ্বিধা না করে গুলী ছুঁড়েছিলো শুভ্রবসনাকে লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়েছিলো শুভ্রবসনার কণ্ঠের করুণ সুর।

রহমান খুশি হয়েছিলো, নিশ্চয়ই সে শুভ্রবসনাকে গুলীবিদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

নূরী আর নাসরিন রহমানের সঙ্গে খুশিতে যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু তারা তখন বুঝতে পারেনি, তাদের জন্য এগিয়ে আসছে এক বিপদ।

রহমান নূরী আর নাসরিন পোড়োবাড়ির দিকে এগুতে থাকে, ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের চারপাশে ঘিরে ফেলে অসংখ্য সশস্ত্র জমকালো পোশাকপরা লোক।

বন্দী করে ফেলে রহমান, নূরী আর নাসরিনকে।

রহমানের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেয় ওরা।

নূরী, নাসরিন এদের কাছেও ছোরা ছিলো, আত্মরক্ষার জন্য এসব অস্ত্র ব্যবহার করতো ওরা। নূরী ও নাসরিনের কাছ থেকে ছোরা দুখানাও কেড়ে নিলো তারা।

রহমান, নূরী আর নাসরিনকে বন্দী করে নিয়ে চললো সশস্ত্র বাহিনী পোড়োবাড়ি খানার দিকে। তারপর তিনজনের চোখ ওরা বেঁধে দিয়েছিলো মজবুত করে।

পোড়োবাড়ির কোন্ পথে কেমন করে, কোথায় ওদের নিয়ে চললো কিছুই বুঝতে পারলো না তারা। যখন তাদের চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো তখন বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো কোনো একটা কক্ষে লৌহ শিকলে তাদের আবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। হাত-পা শিকল বাঁধা, এদিক-ওদিক নড়বার কোনো জো নেই।

অল্পক্ষণ পরই হঠাৎ বনহুরের আবির্ভাব ঘটেছিলো সেখানে। নূরী, রহমান আর নাসরিন মুহূর্তে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই বনহুর বন্দী হয়েছিলো দুর্ধর্ষ সশস্ত্র লোকগুলোর হস্তে।

বনহুরকে বেঁধে ফেললো ওরা লৌহশিকল দিয়ে।

নূরী উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলো—হুর। আমার হুর--

বনহুর শুধু তাকালো রহমান, নূরী আর নাসরিনের দিকে। কোনো কথাই বললো না সে।

নূরী আর রহমান ভেবেছিলো, বনহুরকেও বন্দী করে তাদের পাশেই রাখা হবে কিন্তু তা হলো না, বনহুরকে লৌহশিকলে আবদ্ধ করে নিয়ে গেলো ওরা অন্য স্থানে।

নূরী কাঁদতে লাগলো।

রহমানের মুখ গম্ভীর কালো হয়ে উঠেছে।

নাসরিন ব্যথাকরুণ মুখে তাকাচ্ছে রহমান আর নূরীর মুখের দিকে।

রহমান গভীরভাবে চিন্তা করছে কেমন করে এমন হলো। কিভাবে এখন এদের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

❑

শুভ্রবসনা এসে দাঁড়ালো বনহুরের লৌহশিকলে আবদ্ধ সংজ্ঞাহীন দেহটার পাশে।

বনহুরকে লৌহবলয় দ্বারা মজবুত থামের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। হাত দু'খানা দু'পাশে শিকল দ্বারা আটকানো। পা দু'খানা বাঁধা রয়েছে দু'দিকে টান করে। মাথাটা কাৎ হয়ে আছে ঘাড়ের উপর। দেহের স্থানে স্থানে ক্ষত-বিক্ষত চিহ্ন। তার দেহের মূল্যবান জামাটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে।

শুভ্রবসনা বনহুরের ক্ষত-বিক্ষত দেহে তার কোমল হাতখানা বুলিয়ে চললো। মাথাটা সোজা করে ধরলো একবার। শুভ্রবসনার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোটা ফোটা অশ্রু।

শুভ্রবসনা এবার করতালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন বলিষ্ঠ লোক সেই কক্ষে এসে দাঁড়ালো, কুর্ণিশ জানালো মস্তক নত করে।

শুভ্রবসনা নারীমূর্তিটি বললো—একি করেছো তোমরা, একে কেনো এভাবে শাস্তি দিয়েছো?

দু'জন বলিষ্ঠ লোকের মধ্যে একজন বললো—পালাতে চেষ্টা করেছিলো তাই আমরা---

গর্জন করে উঠলো শুভ্রবসনা —পালাতে দিলে না কেনো? কি সর্বনাশ করেছো। এভাবে একে তোমরা---

বলিষ্ঠ লোক দুটি তখন থরথর করে কাঁপছে।

হাত জুড়ে একজন বললো—মাফ করে দিন রাণীমা। আমরা ভুল করেছি।

মাফ আমি তোমাদের করবো না। তোমাদেরও এভাবে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম লোকটা বললো এবার—রাণীমা, শুধু আমরা দু'জন নই। আমাদের মধ্যে দশ জন মিলে ওকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছি।

আর কে বলেছিলো একে এভাবে শাস্তি দিতে।

ছোট সর্দার।

ডাকো তোমাদের ছোট সর্দারকে।

প্রথম ব্যক্তি একটা বোতামে চাপ দিলো সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কক্ষে প্রবেশ করলো অনেকগুলো বলিষ্ঠ দুর্ধর্ষ চেহারার লোক। তাদের সম্মুখভাগে একটা অদ্ভুত চেহারার লোক। এ লোকটাই তাদের ছোট সর্দার।

কক্ষে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানালো ওরা নত মস্তকে তারপর শুভ্রবসনার সম্মুখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

শুভ্রবসনা কঠিন কণ্ঠে বললো—একে এভাবে বন্দী করেছো তোমরা কার আদেশে?

ছোট সর্দার জবাব দিলো—বন্দীকে পালাবার সুযোগ না দিয়ে নিজেরাই বন্দী করেছি, কারো আদেশের অপেক্ষা না করে।

কিন্তু বন্দীকে এভাবে শাস্তি দেবার কি অধিকার ছিলো তোমার?

বন্দীকে শাস্তি দেয়াই আমার কাজ।

ছোট সর্দার। শুভ্রবসনা হুঙ্কার ছাড়লো।

বলুন রাণীজী? গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিলো ছোট সর্দার।

শুভ্রবসনা তার অন্যান্য অনুচরের দিকে তাকিয়ে বললো,—বন্দী করো একে।

তৎক্ষণাৎ শুভ্রবসনার আদেশ পালন করলো অনুচরগণ। বন্দী করে ফেললো ওরা তাদের ছোট সর্দারকে।

ছোট সর্দার বন্দী হয়ে হিংস্র জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

শুভ্রবসনা আদেশ করলো—বন্দীকে মুক্ত করে তার কক্ষের শয্যায় শয়ন করে দিয়ে এসো। আর ছোট সর্দারকে এই লৌহশিকলে আবদ্ধ করে চাবুক দ্বারা ওর দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দাও।

আচ্ছা রাণীমা। বললো একজন।

শুভ্রবসনা অকস্মাৎ হাওয়ায় মিশে গেলো যেন।

❑

বনহুরের সংজ্ঞা ফিরে এলো একসময়।

পাশ ফিরতেই ব্যথায় টনটন করে উঠলো তার সমস্ত দেহটা।

বনহুরের ধীরে ধীরে মনে পড়লো সব কথা।

রহমান, নূরী, নাসরিন—এদের কথাও স্মরণ হলো তার। এরাও বন্দী হয়েছে পোড়োবাড়ির রহস্যজালে। বনহুর অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভাবলো, বন্দী হবার পর তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক দ্বারা কঠিনভাবে আঘাতের পর আঘাত করা হয়েছিলো তারপর মনে নেই আর কিছু---কিন্তু আবার এই শয্যায় এলো কি করে সে। হাতের আঙ্গুলে অংগুরীটার দিকে তাকালো বনহুর, অংটিটা এখনও তার আংগুলো শোভা পাচ্ছে।

বনহুরের দেহের ক্ষতগুলোতে কোনো ঔষধের প্রলেপ মাখানো হয়েছে লক্ষ্য করে আরও আশ্চর্য হলো। কে তাকে এমন যত্ন সহকারে ঔষধ মাখিয়ে দিয়েছে? তবে কি সেই শুভ্রবসনা?

কিন্তু বনহুর যতই ভাবছে ততই যেন বিস্মিত হচ্ছে, তাকে এভাবে বন্দী করে শাস্তি দেয়ার পর আবার তাকে ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করার চেষ্টা করা---

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আয়নার আবরণ নড়ে উঠে অকস্মাৎ।

বনহুর পূর্বের ন্যায় চোখ দুটো বন্ধ করে পড়ে রইলো সংজ্ঞাহীনের মত।

শুভ্রবসনা প্রবেশ করলো কক্ষ মধ্যে। দক্ষিণ হস্তে তার ঔষধের বাটি। বনহুরের শয্যার পাশে এসে বসলো শুভ্রবসনা।

বনহুরের দেহে শুভ্রবসনা তার কোমল হাতখানা বুলিয়ে দিতে লাগলো; তারপর ক্ষতগুলোতে ঔষধ মাখিয়ে দিলো যত্ন সহকারে।

শুভ্রবসনার আচরণে বনহুর মুগ্ধ না হয়ে পারলো না—কে এই নারী যে তার জন্য এতো দরদ। বনহুর অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু শুভ্রবসনার মুখমণ্ডল দেখতে পেলোনা। পাতলা আবরণে মুখখানা সম্পূর্ণ ঢাকা রয়েছে।

শুভ্রবসনা বনহুরের চুলে কপালে হাত বুলিয়ে দিলো, একটা উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলো বনহুর নিজের ললাটে। বনহুরের সমস্ত দেহমন যেন অপূর্ব এক আবেশে বিগলিত হলো, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হলো পৌরুষসুলভ শিহরণ। বনহুর নিজেকে কঠিনভাবে সংযত করে রাখলো।

বনহুর অনুভব করলো শুভ্রবসনা একটি চাদর তার দেহে চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে যাচ্ছে শুভ্রবসনা সুড়ঙ্গ মুখের দিকে।

বনহুর চাদর সরিয়ে উঠে বসলো।

শুভ্রবসনা ততক্ষণে সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হয়েছে।

আয়নাখানা আবার পূর্বের স্থানে পূর্বের মত স্থির হয়ে বসে গেছে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো শয্যা ত্যাগ করে।

যদিও ব্যথায় জর্জরিত তার সমস্ত শরীর তবু তার কোনো গ্রাহ্য নেই। এগুলো সে সুড়ঙ্গপথে, শুভ্রবসনাকে সে আজ দেখবেই দেখবে।

শুভ্রবসনাকে লক্ষ্য করে এগুচ্ছে বনহুর।

শুভ্রবসনা এসে দাঁড়ালো বনহুরের ছবিখানার পাশে।

বনহুর থমকে আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লো।

শুভ্রবসনা ছবিখানার পাশে দাঁড়িয়ে মোমবাতিটা তুলে নিলো হাতে, উঁচু করে ধরলো তারপর নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো ছবির দিকে।

কতক্ষণ তাকিয়ে রইলো তারপর হঠাৎ নতজানু হয়ে বসে পড়লো ছবিখানার পাদমূলে। পাশের ধূপদানী থেকে ধূম্ররাশি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

শুভ্রবসনা অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ মুঁদে এলো ওর চোখ দুটো, গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। যদিও বনহুর শুভ্রবসনার মুখমণ্ডল দেখতে পাচ্ছে না তবু অনুভব করলো সে রোদন করছে। মোমের আলোতে ধূম্ররাশির মধ্যে শুভ্রবসনাকে অদ্ভুত দেবীমূর্তির মতই লাগছে।

বনহুর শুভ্রবসনার অলক্ষ্যে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

শুভ্রবসনার দু'চোখ মুদিত ছিলো বলে সে টের পেলো না একটুও।

শুভ্রবসনার মুখে আবরণ থাকায় তাকেও বনহুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো না। বনহুর নিজেকে কঠিনভাবে সংযত রাখার চেষ্টা করছিলো।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকালো শুভ্রবসনা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো বিদ্যুৎ গতিতে; সরে পড়ার জন্য পা বাড়াতেই বনহুর খপ্ করে ধরে ফেললো শুভ্রবসনার হাতখানা, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কে তুমি?

অস্ফুট শব্দ হলো—আমি নিশাচর!

বনহুর একটানে খুলে ফেললো ওর মুখের আবরণ।